দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

উত্তরবঙ্গে কথ্যভাষার নামকরণ বিতর্ক : অস্থিরতার অশনি সংকেত
— পৃঃ ১৬

জুন ১৯৭৫ : জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুক্তি সংগ্রাম—পৃঃ ১৯

৬৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ২৬ জুন ২০১৭।। ১১ আষাঢ় - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

পাহাড় দখল করতে নিজেই আগুন জ্বালালেন মমতা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১১ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৬ জুন - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

দিদি, দয়া করে দার্জিলিংকে দ্বিতীয় কাশ্মীর বানাবেন না ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দিদি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ জঙ্গি বটে.. ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির খেলাপ করছে— সংবিধান কী বলে? ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

নির্বাচনের পরে দলবদল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ▯ অর্ণব কুমার ব্যানার্জী ▯ ১৪

উত্তরবঙ্গে কথ্যভাষার নামকরণ বিতর্ক : অস্থিরতার অশনি সংকেত ▯ দেবব্রত চাকী ▯ ১৬

জুন ১৯৭৫ : জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুক্তি সংগ্রাম ▯ অজিত বিশ্বাস ▯ ১৯

দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ফেরানোয় সফল মোদী সরকার ▯ এম জে আকবর ▯ ২৭

সনাতন ধর্মের মূল কথা ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

ভারতাত্মার সন্ধানে অ্যাপ্‌লের জনক ▯ রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭** ▯ **অন্যরকম : ৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যা

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানের পর প্রতিবছর স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে। শ্যামাপ্রসাদ-চর্চার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য নজির। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করবেন মানস ঘোষ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটি অগ্রিম বুকিং করুন।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

দার্জিলিংয়ে অশান্তি

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকা গত কয়েকদিন ধরিয়া অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে। এই অশান্তির জন্য মূলত রাজ্য সরকারই দায়ী। মমতা ব্যানার্জী ভালোভাবেই জানিতেন বাংলা ভাষাকে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে আবশ্যিক ঘোষণা করিলে তাহার ফল কী হইতে পারে। দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ যে তাহাদের মাতৃভাষা নেপালির প্রতি সংবেদনশীল—ইহা সকলেরই জানা। তাই ওই অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা কেন আবশ্যিক করা হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যদিও এইরকম কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া পরে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হইয়াছে। তাহার দায়ভার রাজ্য সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন এমন ভুল হইয়াছে ইহার কারণ তাহাদেরই সন্ধান করিতে হইবে।

ভাষা লইয়া রাজ্য সরকারের এই অনাবশ্যক নির্দেশের ফলে গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পুরাতন দাবিটাই নূতনভাবে উঠিয়া আসিয়াছে। উদ্বেগের বিষয় হইল এই দাবিটি লইয়া স্থানীয় মানুষ পথে নামিয়া বিক্ষোভ দেখাইতেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এই স্পর্শকাতর দাবিটির মোকাবিলায় সংবেদনশীলতার পরিবর্তে বলপ্রয়োগ করিয়াছে। এখনও পর্যন্ত বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিক্ষোভকারী জনতার উপর পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল কিনা। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ইহার ফলে কয়েকজন নিহত বা আহতও হইয়াছেন। পুলিশের তরফে কোনো গুলি চালানো হয় নাই—শুধু এই বিবৃতি দিয়া রাজ্য সরকার নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা হইলে কে বা কাহারা গুলি চালাইয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার দায় রাজ্য সরকারেরই।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে গোর্খা স্বশাসিত পরিষদের (জিটিএ) নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মমতা ব্যানার্জী ও তাঁহার দল রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যেই দার্জিলিংয়ে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকের আয়োজন। এইসব কারণে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা আশঙ্কিত। এই কথা ঠিক, কেন্দ্র সরকার দার্জিলিংয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সহিত এই প্রসঙ্গে বার্তালাপও করিয়াছেন। কিন্তু দার্জিলিংয়ে যাহাতে দ্রুত শান্তির পরিবেশ ফিরিয়া আসে ইহা কেন্দ্র সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে। ইহা গোর্খাল্যান্ড স্বশাসিত পরিষদের সহিত রাজ্য সরকারের মতবিরোধ যাহাতে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়া যায় তাহা দেখিতে হইবে। এই কারণে জরুরি যে মমতা ব্যানার্জী রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে গোর্খাল্যান্ড জনমুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে এমন দোষারোপ করিতেছেন যাহা সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে। ক্ষমতায় থাকাকালীন যে বামফ্রন্ট গোর্খাল্যান্ড দাবির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল আজ তাহারাই আবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে সমর্থন জানাইতেছে। এইসব থেকেই স্পষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থে তাহা জিয়াইয়া রাখিতে চায়।

সুভাষিতম্

ধর্মার্থকামমোক্ষণাম্ আরোগ্যম্ মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।

নীরোগ ও সুস্থ মানুষই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথে চলতে পারে। রোগ স্বাস্থ্যকে অপহরণ করে নেয়। মানুষের কল্যাণ ও জীবনকেও রোগ নষ্ট করে দেয়।

দখলের রাজনীতিতে পাহাড়ে আগুন জ্বালালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিজেদের দোষ ঢাকতে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ বুঝি তৃণমূল সুপ্রিমোকে পেয়ে বসেছে। নইলে দার্জিলিংয়ে যে আগুন নিজের হাতে জ্বালিয়েছেন, তার দায় তিনি এখন বিজেপির ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে চাইছেন। পাহাড়ে অশান্তির শুরুতো সেইদিনই করে দিয়েছিলেন, যেদিন দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী মন্টেক সিংহ আলুওয়ালিয়া নির্বাচিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন জিটিএ গঠনের পরবর্তী সময়ে পাহাড় তাকে ভরিয়ে দেবে। গুরুংরা তার কথাতেই চলছিলেন। তিনি স্বগর্বে ঘোষণাও করেছিলেন পাহাড়ে হাসছে। কিন্তু বাস্তব হলো উল্টো। লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে, তিনি বিমল গুরুংদের এড়িয়ে পাহাড়ে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে লাগলেন। মাঝে মধ্যে গিয়ে তদারকির নামে বিমল গুরুংদের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পরিবারে কী করে ভাঙ্গন ধরানো যায়, সেই পথ খুঁজতেন। এর পর এল পুরসভা নির্বাচন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, রাজ্য সরকার নানা অছিলায় গুরুংদের হেনস্থা করার রাস্তা খুঁজতে থাকে। কিন্তু পুরসভার নির্বাচনে গুরুং তাঁর অসন্তোষকে ব্যালটে রূপ দেয়। পাহাড়ের চারটি পুরসভার তিনটিই দখল করে তাঁরা। গৌতম দেব-কে সরিয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে এনেও কোনো ফল হলো না দেখে সুপ্রিমো হতাশ হয়ে পড়েন। এদিকে গুরুংদের জিটিএ-র কার্যকাল শেষ হচ্ছে ২ আগস্ট। তার আগে জিটিএ-র ৪৫টি আসনে নির্বাচন করতে হবে। আর তাতে যেনতেন প্রকারেণ জিততেই হবে তৃণমূলকে। পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সেই দিকে এগোতে গিয়ে গোর্খাল্যান্ড জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে তৃণমূল সমর্থক তিনটি গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়। এর মধ্যে মদন তামাং গোষ্ঠীও আছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর এই লক্ষ্য স্পষ্ট হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গুরুংরা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাংলা ভাষা আবশ্যিক করার প্রসঙ্গে। মমতা যেখানে ক্যাবিনেট মিটিং করছেন, সেখানে বুঝিয়ে দেওয়া যে ৪৪ বছর বাদে, পাহাড়ের মন না বুঝে যে খেলা খেলছ সেটা ঠিক নয়।

কাশ্মীর নয়, দার্জিলিংয়ের চিত্র।

আন্দোলনকে থামাতে গিয়ে গুরুংদের ফেলা জালে পা দিয়ে ফেলেন সুপ্রিমো। ফলশ্রুতি পাহাড়ে অশান্তি। রাজ্য সরকার সরাসরি প্রশাসনিক সংঘাতে আসে যখন আর্থিক তছরূপের বিষয়টি সামনে রেখে গুরুংদের বিরুদ্ধে অফিসার পাঠিয়ে তদন্তে নামে। লাগাতার ধাক্কা খেয়ে বিমল গুরুং গেরিলা আক্রমণের সূচনা করে বনধ ডেকে দেন। সেই বনধ্ ব্যর্থ করতে ভরা পর্যটক মরশুমে পর্যটকদের আগুনের মুখে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বিমল গুরুংয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেখানে মেলে কিছু তির-ধনুক (যা পাহাড়ি অঞ্চলের সব বাড়িতেই মোটামুটি থাকে), কিছু পটকা, টাকা, আর অস্ত্র-শস্ত্র (স্থানীয় মানুষের দাবি ওইগুলো নাকি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল) সঙ্গে একটা নাইট ভিশন দূরবিন যেটা পাহাড়ে সব বাড়িতেই থাকে। ভুলে গেলে চলবে না বিমল গুরুং এক সময় দার্জিলিংয়ের ট্যুরিস্ট গাইড কাম গাড়ির চালক ছিলেন। যাই হোক, যে কথা মমতাও জানতে পারেননি বা তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীও দিতে পারেনি, সেই ঘটনা ঘটল বিমল গুরুংয়ের বাড়ি তল্লাশি করে সিল করে দিয়ে ফেরার পথে। গেরিলা আক্রমণের মুখে পড়তে হলো বাহিনীকে।

প্রশ্ন হলো, 'কোনো রিপোর্টে কি দেখা গেছে জনশক্তি মোর্চা বোমা বা গুলি ছুড়েছে।' তা নয়। পুলিশ, সেনাবাহিনী, আধা সেনাবাহিনীর ইনসাস বন্দুকের বিপরীতে গুলতি ও পাথর দিয়ে প্রতিরোধ। পাহাড়ে এই অশান্তি সৃষ্টির পেছনে ওয়াকিবহাল মহল মূলত দুটি কারণকে দায়ী করেছেন— (১) স্বায়ত্ত শাসিত জিটিএ-কে উপেক্ষা করে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালু করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং (২) সমতলের কায়দায় পাহাড়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা। এর সঙ্গে বিমলগুরুংদের তরফে যেনতেন প্রকারেণ জিটিএ-র নির্বাচনকে পেছানোই মূল লক্ষ্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার জ্যোতি বসুর হাত ধরে তৈরি হয়েছিল ঘিসিং। আর মমতা ব্যানার্জীর হাত ধরে তৈরি গোর্খাল্যান্ড জনমুক্তি মোর্চা। এই দুই-ই রাজ্য সরকারের দিকে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরেছে। পাহাড় সমতল আবার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। সৌজন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বামী আত্মস্থানন্দের মহাপ্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রবিবার, ১৮ জুন ২০১৭, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চদশ প্রেসিডেন্ট স্বামী আত্মস্থানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। বার্ধক্যজনিত নানা অসুখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে ২০১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তখন থেকে সেখানেই ছিলেন। রবিবার, বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় চিকিৎসকদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর ৯৮ বছর বয়স হয়েছিল। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়েছে, চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি না থাকলেও গত কয়েকদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটছিল। রবিবার যা চরম পরিণতি লাভ করে।

স্বামী আত্মস্থানন্দের জন্ম ১৯১৯ সালের মে মাসে, অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের নিকটবর্তী সবজপুর গ্রামে। ১৯৩৮ সালে তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ। ১৯৪১ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। ১৯৪৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ তাঁকে ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৯৪৯ সালে সন্ন্যাসগ্রহণ। তখন থেকে তাঁর নাম স্বামী আত্মস্থানন্দ।

বেলুড় মঠে এবং পরে দেওঘর (বিদ্যাপীঠ), মায়াবতী (অদ্বৈত আশ্রম) ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার পর স্বামী আত্মস্থানন্দজী মন্ত্রগুরু স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে গুরুর সাহচর্যে তিনি অনেকগুলি বছর কাটান। ১৯৫২ সালে তিনি রাঁচির টিবি স্যানাটোরিয়ামের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। স্যানাটোরিয়ামের সুযোগ সুবিধে যাতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ পান তার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তাঁকে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের সচিব করে পাঠানো হয়। সেবাশ্রমের হাসপাতালটিকে তিনি আধুনিক করে তোলেন। অচিরেই এটি রেঙ্গুনের সেরা হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন বর্মার সামরিক শাসকরা সেবাশ্রমের দখল নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার পর তিনি আর সেখানে থাকেননি। ১৯৬৬ সালে তিনি রাজকোট শাখার দায়িত্ব নেন। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে সন্ন্যাসী না হয়েও সমাজের কাজে ব্যাপৃত থাকার নির্দেশ দেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সুন্দর মন্দিরটি রয়েছে সেটি তাঁর আমলেই তৈরি।

১৯৭৫ সালে স্বামী আত্মস্থানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন, দুটি সংস্থারই সহকারী (সাধারণ) সম্পাদক নির্বাচিত হন। ত্রাণসচিব থাকার সময় তাঁর নেতৃত্বে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে ত্রাণ এবং পুনর্বাসনে তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। ১৯৯২ সালে তিনি মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হন এবং ১৯৯৭ পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। বছরের শেষদিকে তাঁর নাম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০৭ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

স্বামী আত্মস্থানন্দজীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্য, অনুরাগী-সহ সারা দেশ। ব্যক্তিগত শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'স্বামী আত্মস্থানন্দজীর প্রয়াণ খুব কাছের কাউকে হারানোর মতো। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আমি ওঁর সঙ্গে থেকেছি। কলকাতায় গেলেই ওঁর কাছে যেতাম আশীর্বাদের জন্য।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক শোকবার্তা প্রেরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা বেলুড়ে পৌঁছে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সেক্রেটারি মহারাজের হাতে শোকবার্তাটি অর্পণ করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শোকবার্তা

পরমপূজ্য স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজের দেহাবসান আমাদের সবার কাছে গভীর বেদনাদায়ক এবং অপূরণীয় ক্ষতি স্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সেবা, ধর্মজাগরণ এবং আত্মজাগরণের বহমান ধারা দেশে অব্যাহত গতিতে চলছে এবং বেড়ে চলেছে। ২০০৭ সাল থেকে সেই ভগীরথ প্রয়াগের অধ্বর্যু ছিলেন স্বর্গীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তাঁরই অধ্যক্ষতায় স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধজন্মশতাব্দী উপলক্ষে উপরোক্ত ভাবনা দেশের কোণে কোণে সফলভাবে পৌঁছেছে। সেই সময় তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর শান্ত, সাত্ত্বিক ও প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বে আমি উৎসাহিত হয়েছি।

কিন্তু নিয়তির গতি মনুষ্যনিয়ন্ত্রিত নয়। স্বামী আত্মস্থানন্দের প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যবাণী দেশ ও জগতের প্রতিটি স্থানে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র কর্তব্য সমস্ত ভারতবাসীর। তা এই গভীর দুঃখের সময়েও শান্ত ও ধৈর্যসহকারে আমরা যেন সবাই পাই--- এই প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর প্রতি আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

— মোহনরাও ভাগবত, সরসঙ্ঘচালক, আর এস এস

১০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে জামিন পেয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের পূর্বতন মন্ত্রী গায়ত্রী প্রজাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের পূর্বতন মন্ত্রী গায়ত্রী প্রজাপতি দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর নতুন সরকারের আসামাত্রই গ্রেপ্তার হন। আশ্চর্যজনকভাবে গত ২৪ এপ্রিল তিনি জেলা আদালত থেকে জামিনে খালাস পান। এমন একজন অভিযুক্ত ঘৃণ্য যৌন অপরাধীর চটজলদি জামিন পাওয়ায় এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির নজর এড়ায়নি। তিনি ঘটনাটির সত্য উদ্ঘাটনে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আদেশ দেন। চাঞ্চল্যকরভাবে তদন্তে উঠে এসেছে প্রজাপতি এই জামিন কাণ্ডে ১০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবেই কার্যসিদ্ধি করেছেন। জেলা আদালতের তিনজন উকিল যাঁরা জেলা বার আসোসিয়েশনের সদস্যও বটে, তাঁরাই জেলা জজ রাজেন্দ্র সিংহের সঙ্গে একাধিকবার মিটিং করে এই চক্রান্তের রূপ দেন। জেলা বিচারক রণজিৎ সিংহ তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী আগেই নানান রকম সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত বিচারক ও পি মিশ্রকে হঠাৎ পিওসিএসও বিচারক হিসেবে নিযুক্ত

করেন। Protection of children from Sexual offences বিভাগে সাধারণত অত্যন্ত সংবেদনশীল বিচারকদেরই নিযুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, ও পি মিশ্রের কার্যকাল তাঁর নিযুক্তির সময় অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল থেকে আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি ছিল। সমস্ত রকম বিধিনিষেধ ও প্রচলিত নিয়মনীতি ভেঙ্গে একজন বিচারক যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই মামলাটির শুনানি করেছিলেন তাঁকে অপসারিত করে মিশ্রকে নিযুক্ত করা হয়। বিচারপতি দিলীপ ভোঁসলের কাছে জমা পড়া রিপোর্ট অনুযায়ী প্রজাপতির দেওয়া ১০ কোটি টাকার ৫ কোটি ভাগ করে নেন জেলা জজ রাজেন্দ্র সিংহ যিনি মিশ্রকে আইন ভেঙ্গে তড়িঘড়ি নিয়োগ করেন। বাকি ৫ কোটি যে তিনজন উকিল এই কাজে মধ্যস্থতাকারী বা দালালের কাজ করেছিলেন তাঁরা ভাগ করে নেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রাজেন্দ্র সিংহ যিনি উচ্চ আদালতের বিচারপতি পদের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী কার্যবিধি শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় বিচারক ও আদালত মহলে টি টি পড়ে গেছে। পূর্বতন উত্তরপ্রদেশ সরকারের আমলে সাবঅর্ডিনেট বিচার বিভাগে পোস্টিং ও বদলি নিয়ে কী ধরনের দুর্নীতি চালু ছিল এটি তার প্রমাণ।

কেরলের মহল্লার নাম রাতারাতি পাল্টে হয়ে গেল গাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আপনার বাড়ির পেছনের রাস্তা মদন ঘোষ লেন। সকালবেলা উঠে দেখলেন মহম্মদউল্লা লেন হয়ে গেছে। এমন ঘটনাই ঘটেছে কেরলের কাসারগোড় জেলার থুরুতি অঞ্চলে। থুরুতি ওয়ার্ডের অধীনে কাসারগোড় পৌরনিগমের একটি রাস্তার নাম রাতারাতি ইতিহাস খ্যাত ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে অধিকার নিয়ে বিতর্কিত অঞ্চল 'গাজা স্ট্রিপ' রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্তকারী সংস্থাগুলি নড়ে চড়ে বসেছে।

তারা এই নামকরণের পেছনে সন্ত্রাসবাদীদের মদত থাকাটা খতিয়ে দেখছে। বিশেষ করে এই অঞ্চলটি থেকে কুখ্যাত পাদান্না পাড়াটি বিশেষ দূরে নয়। প্রসঙ্গত, কেরল থেকে ২০১৬ সালে যে ২১ জন যুবক নিখোঁজ হয়ে যায় ও যারা আই এস আই এস-এ যোগ দিয়েছে বলে সন্দেহ করা হয় তাদের গরিষ্ঠাংশই এই পাদান্নার অধিবাসী ছিল। থুরুতি জুমা মসজিদ সংলগ্ন এই রাস্তাটির গাজা নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন কাসারগোড় জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি এজিসি বসির। বশির বলেন, তিনি পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে পৌর নিগমের অধীনস্থ ওই রাস্তার নামকরণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার অধিকারী নন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, পৌর কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় হলেও প্রতিষ্ঠান কর্তারা নামকরণ বিষয়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন। পৌর নিগমের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী বিফতিমা ইব্রাহিম তাঁর এলাকায় এই ধরনের কোনো রাস্তার নাম রাখা অস্বীকার করেন।

স্থানীয় বিজেপি নেতারা বিষয়টিকে এখানেই ছাড়তে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী কাসারগোড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্দেশ্য- প্রণোদিত ভাবে এই ধরনের নাম বদল প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি মিউনিসপ্যাল কাউন্সিলের বিতর্কে তুলবেন। মানুষ এই পরিবর্তন স্বীকার না করলে পত্রপাঠ পুরনো নাম ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন পৌর নিগমের বিরোধী দলনেতা পি রমেশ।

৬০ জন হিন্দু শিশুকে ধর্মান্তরকরণের হাত থেকে বাঁচাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধর্মান্তরকরণের জন্য শিশু পাচার করার কথা শুনেছেন কেউ? শোনেননি। এরকমই একটি ঘটনার সাক্ষী হলো রতলম স্টেশন। এদিন ৬০টি শিশুকে ধর্মান্তরকরণের জন্য পাচারের সময়, তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী ও রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনীর জওয়ানরা (আর পি এফ)। এই পাচারের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত আছে বলে তাদের সন্দেহ। এদিন মধ্যপ্রদেশের জনজাতি সমাজের ৬০ জন শিশুকে (৩২ জন বালক ও ২৮ জন বালিকা) ট্রেনে করে ঝাবুয়া স্টেশন থেকে রতলম হয়ে নাগপুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরা সবাই ১০ থেকে ১২ বছরের হিন্দু ঘরের ছেলে-মেয়ে। সন্দেহ জাগে এখানেই। এই শিশুদের একসঙ্গে দেখে ওই ট্রেনের সফররত কয়েকজন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীর সন্দেহ জাগে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্মীদের স্টেশনে চলে আসতে বলেন। আর পি এফ-কেও জানান। এর ফলেই উদ্ধার হয় ওই ৬০ জন শিশু। ঘটনাটি ঘটে গত ২১ মে রাত্রিতে। শিশুদের যে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন বিজয় মইদা। চাপের মুখে সে জানায় যে ঝাবুয়ার ফাদার ফতে সিংহ ওই শিশুগুলিকে নাগপুরে নিয়ে যেতে বলেছিল। অপর এক সঙ্গী জানায় যে এদের নাগপুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাইবেল শিক্ষা দেবার জন্য। পুলিশ তাদের তদন্ত শেষে জানিয়েছে যে এই পাচার হচ্ছিল ধর্মান্তরকরণের জন্য।

উবাচ

“আমি কোনোদিন এভাবে ভাবিইনি। এখন যে দয়িত্ব আসবে তাকে সেভাবেই পালন করব।”

রামনাথ কোবিন্দ
এনডিএ রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী

“এ কাকে প্রার্থী করল? চিনি না, জানি না।”

এনডিএ-র পক্ষে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রসঙ্গে।

মমতা ব্যানার্জী
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

“ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুশির ব্যাপার। বিহারের রাজ্যপাল হিসাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ও বরাবর ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন।”

এনডিএ রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে রামনাথ কোবিন্দ প্রসঙ্গে।

নীতীশ কুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

“কোনো একটা ক্ষেত্রের উপর যদি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তাহলে আইএএফ-এর কার্যক্ষমতাকে সন্তোষজনক ভাবে কাজে লাগানো যাবে না।”

এক ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে।

বি এস ধানুয়া
এয়ার চিফ মার্শাল

“এটা মনে রাখা দরকার সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও ঘৃণা অনেক রকম ভাবেই প্রকাশ পায়।”

লন্ডন মসজিদের কাছে আক্রমণ প্রসঙ্গে।

থেরেসা মে
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

দিদি, দয়া করে দার্জিলিংকে দ্বিতীয় কাশ্মীর বানাবেন না

গূঢ় পুরুষের

কলম

''উত্তপ্ত কাশ্মীর। একের পর এক জঙ্গি দমন অভিযান। সীমান্তে গুলি। জঙ্গি হানায় নিহত ছয় পুলিশ। শেষে খতম লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ পদে থাকা জঙ্গি জুনেইদ মাট্টু। মাট্টুর নিকেশ হওয়ার বদলা নিতেই পুলিশ কর্মীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এতকাল জঙ্গিরা উপত্যকার কাশ্মীরি পুলিশের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীর অ-কাশ্মীরি জওয়ানরা। গত বছর জঙ্গিনেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর মাট্টু তৃতীয় শীর্ষ জঙ্গিনেতা যে পুলিশ-জওয়ানদের গুলিতে প্রাণ হারাল।''

গত শনিবার (১৭ জুন) দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীরে জঙ্গি তাণ্ডব নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবু উল্লেখ করতে হচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়ের অশান্তির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে। বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিরা চাইছে আজাদ কাশ্মীর। দার্জিলিংয়ের গোর্খারা চাইছে স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড। এই দাবি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার মানতে পারে না। অতি স্পর্শকাতর ভারত-পাক সীমান্তে আজাদ কাশ্মীর গড়তে দেওয়ার অর্থ পাকিস্তানের হাতে কাশ্মীর তুলে দেওয়া। ভারতের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা। কাশ্মীরের জঙ্গিরা পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত সশস্ত্র চর। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখা ঠিক নয়। পাকিস্তান নাশকতা চালাতে তাদের অস্ত্র ও অর্থ দুইই জোগাচ্ছে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী পাক জঙ্গিদের বাধা দিলে তারা পাকিস্তানে আশ্রয় নিচ্ছে। পাকিস্তান ভারতের শত্রুদেশ। তাই 'আজাদ কাশ্মীর' গঠন সম্ভব নয়। আমরা কোনো মূল্যেই কাশ্মীরকে শত্রু দেশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে পারি না। আজ ভারত যদি লাহোর বা করাচিকে তার হাতে তুলে দিতে বলে তবে কি পাকিস্তান দেবে? কখনই নয়। এবং ভারতও এমন দাবি করবে না।

কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মকে বুঝতে হবে যে উগ্রপন্থীদের দেওয়া অস্ত্র হাতে তুলে নিলে আজাদ কাশ্মীর গঠনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। কীসের আজাদি? ভারতের দখলে থাকা কাশ্মীর সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই কাশ্মীরে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়। বিধানসভা, হাইকোর্ট সবই আছে। নির্বাচিত সরকার প্রশাসন পরিচালনা করে। উল্টোদিকে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দিকে তাকান। সেখানে উন্নয়নের নামগন্ধ নেই। মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে, অর্থের বিনিময়ে পাক-কাশ্মীর চীনের হাতে তুলে দিচ্ছে ইসলামাবাদ। কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মের নজর এদিকে পড়ছে না কেন বোঝা কষ্টকর। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার টাকা আসছে কোন সূত্র থেকে তা জানার দায়দায়িত্ব কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মের, কাশ্মীরের বুদ্ধিজীবী মননশীল মানুষের। ধর্মীয় ভাবাবেগের উপরে উঠে তাঁদের সন্তানদের বোঝাতে হবে উগ্রপন্থীদের প্ররোচনায় পা না দিতে। পাথর ছুঁড়ে সারা বিশ্বে কোনো দেশ যুদ্ধ জয় করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। এই সরল সহজ সত্যটি কাশ্মীরের তরুণ যুবকরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন ততই মঙ্গল। গত পঞ্চাশ বছরে কাশ্মীরে হাজার হাজার যুবক জেহাদের নামে প্রাণ দিয়েছেন। তাতে কী লাভ হয়েছে? কিছুই নয়। তাছাড়া জেহাদের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরে ইসলাম বিপন্ন এমন আজব অসত্য কথা পাকিস্তানের মোল্লারাও বলবে না। সেখানে ইসলাম ধর্মের আচার আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বরং হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়কে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে মুসলমানরাই বিতাড়িত করেছে। তাই ধর্মযুদ্ধের অধিকার যদি থাকে তবে তা আছে হিন্দু পণ্ডিতদেরই।

নেহরুর ভ্রান্ত নীতির জন্য ভারতকে কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে। অতীতে সিপিএম নেতাদের দাদাগিরি মস্তানির জন্য স্বাধীন গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে পাহাড়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন সুবাস ঘিসিং। তাঁকে শান্ত করতে গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠন করে ঘিসিংকে রাজ্য সরকার স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে। ঘিসিং সাহেব কোটিপতি হয়েছেন। কিন্তু পাহাড়ের দরিদ্র সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। মমতা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পাহাড়ে হাসি ফোটাতে উদ্যোগ নিলে বাংলার মানুষ সাধুবাদ জানায়। যদিও একটা কাঁটা ছিল গলায়। তিনি গোর্খা হিল কাউন্সিল নামটি পরিবর্তন করে নতুন নাম দেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অর্থাৎ তিনি স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড স্বপ্নটি জিইয়ে রাখলেন। এই নাম বদলের কাজটি ঠিক হয়নি। এই স্বপ্নটি যে ভবিষ্যতে রাজ্যের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে মুখ্যমন্ত্রী মনে হয় সেদিন বোঝেননি। তাঁর কাছে জরুরি ছিল জঙ্গলমহল এবং পাহাড়ে শান্তি ফেরানো। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী বুঝে যান যে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা এই বঙ্গে কারুর নেই। এই অহংকার পাহাড়ে বিপদ ডেকে এনেছে। তিনি প্রতিশ্রুতিমতো জিটিএ কর্তৃপক্ষকে স্বায়ত্ব শাসন পরিচালনার পূর্ণ অধিকার দিলেন না। প্রশাসনের কাজ আগের মতোই জেলাশাসকের হাতে রয়ে গেল। বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের চোখের সামনে ঘিসিংকে কোটিপতি হতে দেখেছিলেন।

সেই সহজ পথটি তাঁরাও ধরলেন। মমতা বুঝে গেলেন টাকা ছড়ালে আনুগত্য কেনা যায়। কিন্তু পাহাড়ের প্রতারিত মানুষের ক্ষোভ চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এখনও সময় আছে। ক্ষোভ দূর করতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চুক্তির শর্ত মতো পাহাড়বাসীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। চালাকির মাধ্যমে মহৎ কাজ করা যায় না। এই বঙ্গে আমরা দ্বিতীয় কাশ্মীর চাই না। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে রাজধর্ম পালন করুন। ■

দিদি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ জঙ্গি বটে,

শ্রী বিমল গুরুং

সুপ্রিমো, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা

বিমল দাজু, আপনার মনের কথাটা কেমন ধরে ফেলেছি বলুন! আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন যিনি আপনার সঙ্গে এত সেলফি তুলেছেন সেই কিনা আপনাকে জঙ্গি বলে ডাকছে!

দাজু, আপনাকে একটা গোপন কথা বলে রাখি। তৃণমূল কংগ্রেসের এক মহান নেতা একবার আমায় একটা কথা বলেছিলেন। সেটা আপনি আগে থেকে জেনে রাখলে বিপদ কম হতো। তিনি আমায় একান্তে বলেছিলেন, 'বাজার করো ঘুরে ঘুরে, মমতা করো দূরে দূরে।' আমি পয়সার অভাবে বাজার ঘুরে ঘুরে করি সস্তা পাব বলে। আর মমতা করা তো হলই না এ জীবনে। কিন্তু আমি দিদিকে ভালবাসি।

কারণ, দিদি মানুষ চিনতে পারেন। তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেই তিনি বলে দেন ও ব্যাটা জঙ্গি, ও বেটি মাওবাদী, ও ব্যাটা ভুল চয়েস। উদাহরণ চাই! নিয়ে নিন— এখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি একজনের কথা ভাবুন। ছত্রধর মাহাতো। জঙ্গলমহলের আন্দোলনের সময় তাঁর সাহায্যেই মমতা দিদি দল নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করেন। ছত্রধরের বাইকেও চেপেছেন দিদি। এক সঙ্গে কত কত যৌথ কর্মসূচি। সিপিএম বিরোধী আন্দোলন। তখন মমতাদি বলতেন, মাও-ফাও বলে কিছু নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী জঙ্গলমহল থেকে দূর হঠো। পরে, সেই ছত্রধর মাহাতো হয়ে গেল দেশদ্রোহী। ইউ এ পি এ দেওয়া হলো। কাজের কাজ ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো।

পরিবর্তনের পরে ছত্রধর জেলবন্দি আর তাঁকে ব্যবহার করে যিনি বা যাঁরা জঙ্গলমহলে রাজনীতি করলেন তাঁরা মসনদে। ছত্রধর এখন খারাপ কিন্তু বাকিরা সৎ।

দিদিমণি মহাকরণ অভিযানে জঙ্গি আন্দোলন করেছিলেন। সেদিন একটি মেয়ের জন্য বিচার চাইতে গিয়ে পুলিশের আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে কামদুনিতে একটি মেয়ের জন্য বিচার চাইতে গিয়ে মৌসুমি, টুম্পা কয়ালরা হয়ে যান মাওবাদী। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী মেয়ে একটা কঠিন প্রশ্ন করে ফেলায় হয়ে যায় নকশাল। সে বাংলা ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছে লেখাপড়া করতে। সাংসদ কে ডি সিংহের বিমানে চেপে রাজ্যে পরিবর্তন আনার পরে দিদি এখন বলছেন, ওটা ভুল চয়েস ছিল। একই তালিকায় অনেক সুবিধা দেওয়া কুণাল ঘোষ।

এবার আপনার পালা বিমল দাজু। দিদি বলেছেন বিমল গুরুংয়ের জঙ্গিযোগ আছে। অতএব আছে। পুলিশও এটা প্রতিষ্ঠা করার মতোই খবর বাজারে ছাড়বে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আপনাকে কে ব্যবহার করেছে? কে বৈঠক করেছে? কে যৌথ সভা করেছে? মমতাদি করছেন। শুরুতে গোর্খাল্যান্ড নামটা রেখেই জিটিএ গঠন করেছেন।

দিদিই এটা পারেন। দিদি জঙ্গি, মাওবাদী, নকশাল তকমা দিতেই পারেন। কারণ, দিদির হাতে পুলিশ, প্রশাসন, গোয়েন্দা। কিন্তু এখন কেন! সরকারি টাকায় গরম পড়লেই বন্ধু-বান্ধব, মন্ত্রী, সান্ত্রী, আমলা বাহিনী নিয়ে সরকারি পয়সায় শৈলশহরে ভ্রমণে যান ফি বছর। ক্লান্তি কাটাতে বছরে একাধিকবার। এতদিনে কেউ খবর রাখল না বিমলের দলের জঙ্গিযোগাযোগ!

দিদির একটা থিওরি আছে। জঙ্গলমহলের পরে পাহাড়েও সেই 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' থিওরি দেখিয়ে দিলেন দিদিমণি। বিমলের জোরেই 'পাহাড় হাসছে' প্রচার করেছেন দিদি। জঙ্গি যোগাযোগ থাকা বিমল গুরুংদের সঙ্গেই। মাওবাদী যোগাযোগ থাকা ছত্রধরদের সঙ্গে নিয়েই বলেছেন 'জঙ্গলমহল হাসছে! এগুলোও কি জঙ্গি বা মাওবাদী যোগ নয়? সব এড়িয়ে হাত ধুয়ে মুছে ফেলা যায়!

হ্যাঁ যায়। দিদির রাজনীতিতে এটা সম্ভব। এটাই দিদির বিশেষত্ব। সুবিধা দেওয়া সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডুরা তো দূরের লোক, দলের তাপস পাল নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছেন। সুদীপ্তও মোটামুটি তাই। কুণাল, মদন তো করবেই। কেডি, দিনেশ ওরা তো আর দলের কেউ নয়। এখন এক এক করে নারদ ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবেন। ওরা টাকা নিয়েছে। আমি তো নিইনি।

বিমল দাজু, আপনি তো পাহাড় নিয়ে ভাবছেন। দিদির আরও বড় চিন্তা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ভাইপোটাকেও টানবে। এক্ষেত্রে তো হাত ধুলেই শুধু হবে না। রক্তের সম্পর্ক যে!

—সুন্দর মৌলিক

কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির খেলাপ করছে—সংবিধান কী বলে?

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জী, দিল্লিতে কেজরিওয়াল প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী ও অনেক বিরোধী নেতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ করে চলেছেন। তাঁদের মতে, আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্র বিভিন্ন দিক থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করে এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। তাঁরা মনে করেন— এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী ব্যাপার।

অবশ্য আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র বা 'federal' কথাটা ব্যবহার করেনি— বরং ভারতকে একটা 'union of states' বলে বর্ণনা করেছে (১ম অনুচ্ছেদ)। কিন্তু সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার লক্ষণগুলো সযত্নে রক্ষা করেছে। এতে আছে দুই ধরনের সরকার। সংবিধান দ্বারা তাঁদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে তাদের সহযাগিতার ব্যবস্থা এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য একটা সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সুতরাং বলা চলে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য নানা দিক থেকে কেন্দ্রকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য। তাছাড়া কেন্দ্রের হাতে রয়েছে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা (৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০ নং অনুচ্ছেদ)। রাজ্যের শাসকপ্রধান রাজ্যপালকে করা হয়েছে কেন্দ্রের প্রতিভূ। আরও রয়েছে অভিন্ন ও অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা, এক নাগরিকত্ব, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি। এই কারণে ড. কে. সি. হোয়ার ভারতকে আধা যুক্তরাষ্ট্র বা 'quasi federal' হিসেবে গণ্য করেছেন। কেউ কেউ আবার এটাকে 'more unitary than federal' বলেছেন, অনেকে এটাকে ধরে নিয়েছেন 'centralised federation' হিসেবে।

কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর (১৯৪৯) ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্র রাজ্য-বিরোধ দেখা যায়নি। অবশ্য তার কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কংগ্রেস জলোচ্ছ্বাসের মতো সারা দেশে একচ্ছত্র ক্ষমতায় ছিল— তার সঙ্গে এই নিয়ে মতবিরোধ ধরা পড়েনি, মনে হয়--- ছোটখাটো দ্বন্দ্ব দলীয় স্তরেই মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন ক্ষমতায় এসেছে অকংগ্রেসি সরকার তখনই বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। অনেক রাজ্য-সরকার চেয়েছে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা এবং অন্য বিষয়ে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা।

১৯৮১-৮২ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছে— হৃত রাজ্যগুলো আবার এসেছে তাঁর দখলে। সুতরাং রাজ্যের হাতে ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবিটা আবার স্তব্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য রাজীব গান্ধীর পর আবার এসেছে কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাসের যুগ। সাম্প্রতিককালে আবার সেই পুরনো দাবিটা জোরালো ভাবে উঠে পড়েছে। অবশ্য কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, কংগ্রেসের আধিপত্যের যুগে কোনো কোনো রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সি.আর.পি.-কে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সব রাজ্যের বক্তব্য ছিল--- আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয় সুতরাং তাদের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্র এভাবে সি.আর.পি.-কে কাজে লাগাতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র রাজ্যপালকে নিযুক্ত করে এবং যে কোনো সময় পদচ্যুত করতে পারে (১৫৪ ও ১৫৫ নং অনুচ্ছেদ)। এভাবে রাজ্যপালকে কেন্দ্রের 'এজেন্ট'-এ পরিণত করা হয়েছে--- (ডবলিউ এইচ. মরিস জোন্স— গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৮০)। তার ফলে কেন্দ্রের নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্যপাল রাজ্য ক্যাবিনেটের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের ধর্মবীর, এস. এস. ধাওয়ান, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, সিকিমের এন বি ভাণ্ডারী, অন্ধ্রের রামলাল প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়ত, ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করে কেন্দ্র বারবার অ-কংগ্রেসি রাজ্যসরকারকে উচ্ছেদ করেছে, অথচ সেগুলোও এসেছিল নির্বাচনের মাধ্যমে।

চতুর্থত, রাজ্যগুলোর আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত। ট্যাক্স থেকে তাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ আসে না--- তাছাড়া কেন্দ্রের আদায় করা ট্যাক্সের ওপর রাজ্যের প্রাপ্য অংশও অনেক সময় দেওয়া হয় না। তাদের 'নোট্' ছাপানোর অধিকার নেই। বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার ক্ষমতাও রুদ্ধ।

পঞ্চমত, প্ল্যানিং কমিশন এই কেন্দ্রীয়করণকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করেছে। অর্থ-কমিশন, নির্বাচন-কমিশনও আসলে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তাঁদের মতে, এই সব কারণে রাজ্যের স্বাধিকার বিনষ্ট হয়েছে, দেখা দিয়েছে আঞ্চলিকতার ঝোঁক।

১৯৬৯ সালে তামিলনাড়ু সরকার রাজা মান্নার কমিটি গঠন করে এই সব প্রস্তাবগুলো দিয়েছিল—

(১) ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে বাতিল করতে হবে; (২) কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য একটা আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল তৈরি করতে হবে; (৩) ২৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেন্ট যেসব আইন রচনা করে, সেগুলো বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাজ্যকে দিতে হবে, (৪) ট্যাক্স বসানোর পর্যাপ্ত ক্ষমতা রাজ্যকে দিতে হবে এবং (৫) রাজ্যপালের ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

কিন্তু ড. শিব কাপুর মন্তব্য করেছেন, 'The Rajamannar Committee, Report is wholly unsatisfactory— (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৪৩)। তাঁর মতে, এই রিপোর্টের গুরুত্ব অবশ্য আছে— বিশেষ করে, রাজ্যের আর্থিক

ক্ষমতা বিস্তৃত করা দরকার, রাজ্যপালের ভূমিকা কিছুটা খর্ব করা উচিত— কিন্তু এভাবে সংবিধানকে পুনর্লিখিত করা যায় না। তার কারণ, অনেক ভাবনা চিন্তার মাধ্যমেই বর্তমান সংবিধান রচনা করা হয়েছে। কেন্দ্র অবশ্য ১৯৮৩ সালে সরকারিয়া কমিশন গঠন করেছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই কমিশন কিছু মূল্যবান প্রস্তাব দিয়েছে। যেমন—

(১) ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে বাতিল না করে বরং এর ব্যবহারকে সীমিত এবং নির্দিষ্ট করতে বলা হয়েছে; (২) রাজ্যপালের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে বলেছে; (৩) রাজ্যপাল নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছে; (৪) বিচারপতিদের বদলির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছে; (৫) আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল তৈরির জন্য সুপারিশ করেছে এবং (৬) যুগ্ম-ক্ষমতার বিষয়ে সমঝোতা চেয়েছে।

বলাবাহুল্য, এই কমিশনের সুপারিশগুলো ছিল অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তবমুখী। ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'The Commission is opposed to any drastic or radical change of the existing constitutional set-up (ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩০৩)। আমাদের জীবন পরিবর্তনশীল, রাষ্ট্রীয় জীবনও সেই রকম। সুতরাং রাষ্ট্রীয় জীবন, সংবিধান, আইন, ইত্যাদির মধ্যে প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। সরকারিয়া কমিশন তাই সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সংবিধানের অনেকটা খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছে— কিন্তু সংবিধানের দুই মলাটকে রেখে ভেতরটা পুরো বদল করতে বলেনি।

সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। কিন্তু সেটা করতে হবে সুচিন্তিতভাবে। আমাদের রাজ্যগুলোর হাতে কিন্তু কম ক্ষমতা নেই। ড. বি. সি. রাউত মন্তব্য করেছেন, 'The states in India are not mere eogs in the faderal system'— (ডেমেক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৮৭)। তারা স্বাধীন সংস্থা নয়— তারা অখণ্ড ভারতের অংশ। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ ও সর্বজনীন ঐক্যের জন্য তাদের ওপরে একটা কেন্দ্রীভূত শক্তিকে রাখতেই হবে। ড. এম. ভি. পাইলির ভাষায়— 'they have at their disposal substantial powers covering a large area'--- (অ্যান্ ইনট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২০)। রাজ্যপালের ক্ষমতা হ্রাস, ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যুগ্ম ক্ষমতার ব্যাপারে সমন্বয়, প্ল্যানিং কমিশনের কাজে কিছু নিয়ন্ত্রণ, রাজ্যের আয় বৃদ্ধি, অর্থ কমিশনের ক্ষমতা-সম্প্রসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই কমিশন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে বাস্তবমুখী করতে চেয়েছে। কমিশনের এই সব সুপারিশের দ্বারাই বর্তমান সমস্যার সুরাহা করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার। কেন্দ্রকে যেমন রাজ্যের স্বাধিকারের কথা স্মরণ রাখতে হবে, তেমনি কিন্তু রাজ্যকেও কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র যেমন অনধিকার চর্চা করেছে, কোনো কোনো রাজ্য তেমনি অযথা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে দুই পক্ষের তিক্ততা।

সম্প্রতি দুটো বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো কোনো রাজ্য-সরকারের মতভেদ দেখা দিয়েছে। প্রথমত, কেন্দ্রের নোট-নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন অনেক রাজ্যের শাসকরা। এটা ঠিক যে এই ব্যাপারটার মধ্যে পরিকল্পনার অভাব এবং পদ্ধতিগত অনেক ত্রুটি ছিল— কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়েছেন, সেটা বিস্ময়কর। প্রধানমন্ত্রীকে হঠাতে হলে লোকসভায় অন্তত ২৭৩ জনের সমর্থন দরকার। তৃণমূল-কংগ্রেস ও তার মিত্রদের পক্ষে সেটা জোগাড় করা কি এখন সম্ভব?

দ্বিতীয়ত, কলকাতায় এবং আশেপাশের কিছু শহরের টোলপ্লাজায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁরা যানবাহনের হিসেব রাখছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে— কারণ এর জন্য নাকি অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাছাড়া সেনাদের বিরুদ্ধে তোলা নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের সেনা মোতায়েনের অধিকার আছে বলে মেজর জেনারেল হর্ষ বেকার দাবি করেছেন ---(মিলিটারি ড্রাগ্‌ড ইন টু পলিটিক্যাল ব্যাটল্', দ্য স্টেটুস্‌ম্যান, ৮.১২.১৬)।

অনুরূপভাবে মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন, এটা সামরিক বাহিনীর রুটিন-কাজ--- এটা আদৌ সেনা-অভ্যুত্থান নয়। ('সেনা-অভ্যুত্থান নয়', স্বস্তিকা, ১৯.১২.১৬)। এই সব নেতা নেত্রী সেনা-প্রধানের নিয়োগের ব্যাপারেও অন্যান্য সমালোচনা করেছেন। বিপিন রাওয়াতকে সম্প্রতি ওই উচ্চ পদে আনা হয়েছে দু'জন সিনিয়ারকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দলবীর সিংয়ের ৩১ ডিসেম্বরেই অবসর নেওয়ার কথা— তাহলে মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাঁকে ওই পদে নিযুক্ত করাটা অনুচিত হোত। আরও বড় কথা হলো— সেনাবাহিনীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব সময় প্রবীণতার প্রথা মানা হয় না। সব দেশের ক্ষেত্রেই এই কথা চলে। সেটাই সরকারের 'prerogative।' এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নেতা-নেত্রীরা অনধিকার চর্চা করেছেন রাজনৈতিক স্বার্থে।

আরও কথা উঠেছে, আয়কর দপ্তরের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে অভিযান চালানো নিয়ে। মমতা ব্যানার্জী এটা নিয়েও আপত্তি তুলেছেন, এই নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু আয়কর কেন্দ্রীয় বিষয়, সেই জন্যই ওই দপ্তর জানিয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে আয়কর দপ্তর ওই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এই নিয়ে উদ্বেগ বা ক্রোধ প্রকাশের কিছু নেই। অবশ্যই আমাদের দেশে সাংবিধানিক কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবিস্তার করে। কিন্তু রাজ্য-সরকার ও নেতাদের উচিত সব কিছুতে রাজনীতিকে না টানা এবং এক্তিয়ার লঙ্ঘন না করা।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)

নির্বাচনের পরে দলবদল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

অর্ণব কুমার ব্যানার্জী

হালে নির্বাচনের পর দলবদলের একটা হিড়িক পড়েছে। কিন্তু এই দলবদল কি আইনসিদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। কারণ এই দলবদল হলো দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং চরম স্বার্থপরতার লক্ষণ। তাই এবিষয়ে সংবিধান কী বলে সেটা জানা প্রয়োজন। এই লেখাতে সংবিধানের ব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মামলার রায় এবং আইন কমিশনের রিপোর্ট থেকে।

সংবিধান কী বলে?

সংবিধানে বাহান্নতম সংশোধনী এনে ১৯৮৫ সালেই দশম তপশিল অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই দলবদলের পরিণাম হচ্ছে সাংসদ ও বিধায়ক পদচ্যুতি। একে ইংরাজিতে defection বলে। এই তপশিল আর্টিকেল ১০২ (২) আর ১৯১ (২)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসেবেই যুক্ত করা হয়েছিল। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে যদি কোনো প্রার্থী নির্বাচনের পরে দল ত্যাগ করে তাহলে তিনি সাংসদ/বিধায়ক পদ হারাবেন। এ বিষয়ে লোকসভা আর বিধানসভার স্পিকারের মতই চূড়ান্ত হবে আর কোর্টের এ বিষয়ে কিছু করার থাকবে না।

দলত্যাগ বলতে কী বোঝায়?

দলত্যাগ মানে কি দলের সদস্যপদ ত্যাগ না অন্য কিছু? এই প্রশ্নের উত্তরে Mayawati vs. Markandeya Chand & Ors on 9 October, 1998 মামলায় বিচারপতি বলেন :

The direction of a member of the House can be from a functionary of a political party outside the House according to the constitution of the respective parties. The label which a member carries and ultimately goes to constitute his Legislature

Party under rule 4 (2) is an agency outside the House. A member is disqualified for giving up that label and not the membership of the Legislature Party.

অর্থাৎ দল ও তার সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক হলো এজেন্ট আর প্রিন্সিপাল-এর। এর অর্থ হলো প্রিন্সিপাল এজেন্টকে যা করতে বলে এজেন্ট তাই করে। দল তার সদস্যদের যা করতে বলে সদস্যদের তাই করতে হয়। এই এজেন্ট-প্রিন্সিপাল সম্পর্কটা থাকে না যখন সদস্য দলের নির্দেশ অমান্য করে। যখনই নির্দেশ অমান্য করে তখনি দলত্যাগ হয়। শুধু দলের খাতা থেকে নাম কাটা গেলে দলত্যাগ হয় না। অর্থাৎ দল থেকে পদত্যাগে কোনো দলত্যাগ হয় না। এই অনুমানের স্বপক্ষে Anitha Baby vs. Kunjappan Painkily on 23 May, 2014 মামলায় বলা হয়েছে যে দলত্যাগ দল থেকে পদত্যাগ নয়।

দলত্যাগ হয়েছে তা কী করে বোঝা যাবে?

ওপরের দলত্যাগের সংজ্ঞা অনুসারে দল থেকে পদত্যাগ দলত্যাগ নয়। যখন কোনো প্রার্থী দলের নির্দেশ মেনে চলে না তখনই দলত্যাগ হয়। কীভাবে জানা যায় যে প্রার্থী দলের নির্দেশ মানছেন না? Ravi S. Naik vs. Union of India (AIR 1994 SC 1558) মামলায় বলা হয়েছে যে "the Legislature has left the disqualification to be decided on the defined conduct of the member... Even in the absence of a formal resignation from membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs."

অর্থাৎ প্রার্থীর ব্যবহার থেকে বা আরো পরিষ্কার করে বললে, প্রার্থীর কাজ থেকে বোঝা যায় যে তিনি দলত্যাগ করেছেন কিনা বা দলের নির্দেশ অমান্য করেছেন কিনা। এই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে V.V. Varghese vs. The Kerala State Election...on 12 June, 2009, Rajendra Singh Rana vs. Swami Prasad Maurya ((2007) 4 SCC 270) ইত্যাদি মামলাগুলিতে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এক পার্টি অনেক সময় বিপক্ষ পার্টিতে নিজেদের লোক ঢোকায়। একে ইনফিলট্রেশান বলে। ওই লোকগুলি ঢুকে বিপক্ষ পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর গোপন খবর পাচার করে বিপক্ষ পার্টিকে ধরাশায়ী করে দেয়। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু যে লোকগুলিকে বিপক্ষ পার্টিতে ঢোকানো হয়েছে তারা গোড়া থেকেই তাদের নিজেদের পার্টির নির্দেশ মেনে চলছে। তাদের দলত্যাগী বলা যাবে না। এই বঙ্গে যখন রাহুল সিনহার নেতৃত্বে বিজেপি উঠছিল তখন তৃণমূল ওই পার্টিতে নিজেদের লোক ঢোকায়। প্রথমে মনে হয়েছিল যে তৃণমূল থেকে লোকে দলে দলে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে বা দলত্যাগী হচ্ছে। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে ওই লোকগুলোই বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ডেকে এনে নির্বাচনে বিজেপির পতন ঘটালো। তখন বোঝা গেল যে ওরা তৃণমূলের নির্দেশে চলছিল। এক্ষেত্রে ওই লোকগুলোকে কিন্তু দলত্যাগী বলা যাবে না যদি দলত্যাগের অর্থ পার্টির নির্দেশ অমান্য করা হয়।

দলত্যাগের কারণ কী?

দলত্যাগের কারণ কিছু আইনে বলা নেই তবে আইনের ইতিহাস (legislative his-

tory) পর্যালোচনা করলে তা জানা যায়। এই দলবদলের ঘটনা ভারতের নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথম ঘটেছিল ১৯৬৭-তে। এই সময় ব্যাপক হারে দলবদল হয়। ফলে ভারতে কংগ্রেস এককভাবে জিততে পারেনি। সেই প্রথম জোট সরকারের জমানা চালু হয়। যেসব সাংসদ-বিধায়ক দলবদল করেছিল তারা বড় বড় মন্ত্রিত্ব পায়। এই ঘটনার ১৭ বছর পর এই দশম তপশিল আসে। এই ১৭ বছর ধরে বহু দলবদল হয়েছিল। এছাড়া, The Dinesh Goswami Committee on electoral reforms (1990) এর মতামত The main intent of the law was to deter "the evil of political defections" by legislators motivated by lure of office or other similar considerations. অর্থাৎ পদের লোভে বা অন্য কিছুর লোভে (similar considerations) দলত্যাগ। similar consideration যে অন্য কিছুর লোভে এটা ejusdem generis নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুতরাং এই অনুমান করাটা অযৌক্তিক হবে না যে ব্যক্তিগত লোভের কারণে নিজে থেকে দলত্যাগ করলে দশম তপশিল উল্লঙ্ঘন করা হবে। এর থেকে বোঝা যায় যে দলবদলের পিছনে মন্ত্রিত্বের লোভ ছিল। ভয় ছিল না। কোনোরকম ক্ষতির ভয় ছিল না। প্রাণের ভয় তো ছিলই না।

বর্তমান অবস্থা এই বঙ্গে এমন যে শাসক দল প্রাণের ভয় দেখিয়ে আর মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের দলত্যাগে বাধ্য করছে। কংগ্রেসের মানস ভুঁইয়া এর একটা উদাহরণ। পুরভোটে বিজেপির দুই প্রার্থীর দলত্যাগ আরেকটা উদাহরণ। এইরকম দলত্যাগ কখনই নিজে থেকে দলত্যাগের কারণ হতে পারে না। এটা জবরদস্তি দলত্যাগ, যেটা এই বঙ্গের ট্রাডিশন। এতে কখনই দশম তপশিল উল্লঙ্ঘন হয় না।

যখন লেখাটি লিখছি তখন একজন সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে তৃণমূল কর্মীরা বোমা মেরেছিল। এখন ওই সিপিএম সমর্থক প্রাণ বাঁচাতে নিজে থেকে দলত্যাগ করে তাহলে কখনই সেটাতে দশম তপশিল উল্লঙ্ঘন হয় না। এর আইনের ইতিহাস ছাড়াও আরো একটা কারণে ভয় দেখিয়ে দলত্যাগ দশম তপশিলের উল্লঙ্ঘন নয়। কারণটা সাংবিধানিক। প্রতিটি মানুষেরই বাঁচার অধিকার আর্টিকেল ২১ দ্বারা দেওয়া আছে। যদি প্রাণের ভয় দেখিয়ে দলত্যাগ করাটা দশম তপশিলের উল্লঙ্ঘন হয় তাহলে সেটা আর্টিকেল ২১-এর সাংবিধানিক অধিকারকে ভঙ্গ করে। কাউকে যদি মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে দলত্যাগে বাধ্য করা হয় তাহলেও সেটা আর্টিকেল ২১-এর উল্লঙ্ঘন হয়, কারণ সেটা মানুষকে জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু দশম তপশিল কোনোভাবেই সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলি উল্লঙ্ঘন করার কথা বলে না। এটাকে বলে প্রিন্সিপাল অব প্রসপেক্টিভ ওভাররুলিং। I.C Golaknath case-এ চিফ জাস্টিস সুব্বা রাও এই নীতি তৈরি করেন। এর অর্থ হলো পার্লামেন্ট কখনো সংবিধানের মৌলিক অধিকার কাটছাট করতে পারে না। দশম তপশিল অন্তর্ভুক্ত পার্লামেন্ট কখনই আর্টিকেল ২১-এর মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করেনি।

এছাড়া Kihoto Holohan vs. Zachilhu and others কেসে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে যে the law does not violate any rights or freedoms, or the basic structure of parliamentary democracy.

তবে ব্যক্তিগত লোভের কারণে যারা দলত্যাগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে দশম তপশিল উল্লঙ্ঘনের কেস হতে পারে। এরকম বহু এমপি এবং এমএলএ আছে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে দলত্যাগী। এদেরকে সরাসরি দশম তপশিলের কেসে ফেলে মেম্বারশিপ খারিজ করে দেওয়া যেতেই পারে।

দশম তপশিলের নানা সংশোধন :

শুরুতে দশম তপশিল দলের স্প্লিট বা বিভাজনের কারণে দলত্যাগ আর প্রিসিডিং অফিসারের দলত্যাগকে ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিন্তু পরে এই স্প্লিট নিয়ে নানাবিধ সমস্যা হতে লাগলো। তখন ৯১তম সংশোধনী এনে ওই স্প্লিটকে তুলে দেওয়া হলো। এখন স্প্লিট-এর ফলে দলত্যাগ হলেও সদস্যপদ যাবে। একই সংশোধনীতে প্রিসিডিং অফিসারকেও বাদ দেওয়া হলো না। ওই অফিসার দলত্যাগ করলেও তার সদস্যপদ যাবে। তবে দুটো দল মার্জ করে যাবার ফলে যদি দলত্যাগ হয় তাহলে সেটাকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

দশম তপশিলের আইনি ব্যাখ্যা :

১. দশম তপশিল কি বিভিন্ন সাংসদ/বিধায়কদের বাক স্বাধীনতা হরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে পাঁচজন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছিলেন Kihoto Hollohan vs. Zachilhu and others কেসে যে এই তপশিল কোনো মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে না বা সংসদীয় গণতন্ত্রের ধাঁচা পাল্টায় না।

২. দশম তপশিল কি সমস্ত ভোটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না কেবল আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? The Dinesh Goswami Committee on electoral reforms (1990) বলেছে যে ভোটাধিকার এমন সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রভাবিত হতে পারে যা সরকারের স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাই এই আইন শুধু আস্থা ভোটের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা হোক। অর্থাৎ যে ভোটে সরকারের বাঁচা মরা নির্ভর করছে শুধু সেই ভোটেই দশম তপশিল লাগিয়ে দলবদল আটকানো হোক। অন্য ভোটগুলিতে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হয় না। তাই দশম তপশিলের দরকার নেই।

উপসংহার :

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি ব্যক্তিগত লোভের কারণে দলত্যাগ হয় তাহলে দশম তপশিলের উল্লঙ্ঘন হয়। কিন্তু যদি প্রাণের ভয়ে বা মিথ্যা মামলায় ভয়ে দলত্যাগ হয় তাহলে তপশিল উল্লঙ্ঘন হচ্ছে না। দলত্যাগ করা আসলে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এই বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত সাংসদ-বিধায়ক পদ খারিজ। আইন এই কথাই বলে। ■

উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষার নামকরণ বিতর্ক

অস্থিরতার অশনি সংকেত

দেবব্রত চাকী

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবনে স্থানীয় কথ্য ভাষার (পড়ুন কামরূপী উপভাষা) স্বীকৃতি ও নামকরণের প্রশ্নে সাম্প্রতিককালে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক সৃষ্টির মূলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষার স্বীকৃতির বিষয়ে ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির উপর দায়িত্ব বর্তিয়েছে কথ্য ভাষায় স্বীকৃতি ও নামকরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার। গত ১৯ মার্চ, ২০১৭ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে রাজ্য সরকারের মিনি সেক্রেটেরিয়েট উত্তরকন্যায় এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী কবি সুবোধ সরকার, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. বিজয় কুমার সরকার, ড. ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বজলে রহমান অংশগ্রহণ করেন। ইতিহাস গবেষক ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির সভাপতিত্বে এই সভায় কমিটির অপর সদস্য রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মণ অনুপস্থিত ছিলেন।

কাকতালীয় কিনা জানি না, পশ্চিমবঙ্গের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যায় যখন কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষার স্বীকৃতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক ওই সময়ে ওইদিনে পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী নিম্ন অসমের বিভিন্ন এলাকায় পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে তিন ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট বা ধরনার কর্মসূচি পালন করে কামতাপুর রাজ্যের সমর্থকরা। অল কোচ-রাজবংশী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (AKRSU-H) এবং অল কোচ-রাজবংশী মহিলা সমিতির নেতৃত্বে এই ধরনা আন্দোলনের মূল দাবি উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা ও অসমের ১৫টি জেলা নিয়ে পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন, কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি এবং কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের তপশিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। বিষয়টি হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু একই দিনে এই কর্মসূচি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনরত চরমপন্থী সংগঠন কামতাপুর

লিবারেশন অর্গানাইজেশন (K.L.O.)-র সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপ আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ না হলেও কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। কিছুদিন পূর্বে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন ফতোয়া জারি করে যে, ৩১ মার্চ ২০১৭-র মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের অসম ও উত্তরবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে। যদি তারা নির্দেশ অমান্য করে তবে তাদের চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি অতি সম্প্রতি অসমের গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত নমামি ব্রহ্মপুত্র উৎসবে তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামার অংশগ্রহণের বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানায় আলফা পরেশ বড়ুয়া গোষ্ঠী। এতে নাকি চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। অর্থাৎ চীনের পছন্দ নয় এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হুশিয়ারি দেয় আলফা। এই আলফার সঙ্গে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (K.L.O.) সম্পর্ক সর্বজনবিদিত।

যাইহোক, কামতাপুরী (রাজবংশী) নামক আখ্যায়িত ভাষার স্বীকৃতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সাম্প্রতিক কার্যকলাপের মধ্যে নয়া সংযোজন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কোচবিহার সফর এবং অতুল রায়ের নেতৃত্বাধীন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির (K.P.P.) জনসভায় অংশগ্রহণ। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার রাজবংশী ভাষাকেও মর্যাদা দেবে ও কামতাপুরী ভাষাকেও মর্যাদা দেবে। তিনি বলেন, রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষাসংস্কৃতির উন্নয়নে যা করা দরকার তা আমি করবো। কামতাপুরীদের ডাকে হাজার পাঁচেক মানুষের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংশগ্রহণ ও বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্যের শাসকদলের অভ্যন্তরেও শুরু হয়েছে ভাষার নামকরণ প্রশ্নে চাপান-উতোর। যার ফলশ্রুতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কারা রাজবংশী? আর কারাই বা কামতাপুরী?

উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতির দাবিতে জনমত তৈরির চেষ্টা দীর্ঘদিনের। কামরূপী উপভাষাকে বা স্থানীয় কথ্য ভাষাকে একপক্ষ রাজবংশী ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করতে সচেষ্ট, অন্যদিকে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবির সমর্থকরা এই কথ্য ভাষাকে

কামতাপুরী ভাষা নামে আখ্যায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পৃথক কামতাপুর রাজ্যের তত্ত্বে বিশ্বাসীদের আন্দোলনের একটি অন্যতম অধ্যায় কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি। উভয় পক্ষই তাদের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি সাজাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। রাজবংশী নামকরণের পক্ষে যারা যুক্তি সাজাচ্ছেন তাদের বক্তব্য এই কথ্য ভাষা উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা। রাজবংশী সমাজ সংস্কারক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা এই কথ্য ভাষাকে কামতা-বিহারী এবং রাজংবশী ভাষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ এই কথ্য ভাষাকে রাজবংশী ভাষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্যে পালাবদলের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসে 'রাজবংশী ভাষা আকাদেমি' গঠন করেন। লক্ষ্য রাজবংশী ভাষার চর্চা ও বিকাশ। যদিও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবয়বে রাজবংশী নামাঙ্কিত সম্প্রদায় কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই বসবাস করে তা ভাবা কখনোই সমীচীন নয়। উত্তরবঙ্গের বাইরে দক্ষিণবঙ্গের, বিশেষ করে হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতেও প্রচুর সংখ্যক রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাস। প্রশ্ন হলো, সকল রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ কি একই নৃগোষ্ঠীভূক্ত। উত্তর নিশ্চিতভাবেই 'না'। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি অংশ যেমন নিজেদের রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করে থাকেন, অনুরূপ ভাবে অনেকেই নিজেদের কোচ-রাজবংশী হিসেবে পরিচয় জ্ঞাপন করতে সচেষ্ট। মূলত ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ভাব-আদর্শে বিশ্বাসী মানুষজন নিজেদের রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচয় জ্ঞাপন করে থাকে। তাদের দাবি মতো যদিও তারা উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় তথাপি আর্থিক ও শিক্ষাগত কারণে পশ্চাৎপদতার পটভূমিতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগে রাজবংশী সম্প্রদায় তপশিলি জাতি হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে কোচ-বাজবংশী হিসেবে আত্মপরিচয় প্রদানকারীরা মুলত অসমের কোচ-রাজবংশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। অসমে কোচ-রাজবংশী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য নিজেদের তপশিলি উপজাতির মর্যাদা লাভ। তারা নিজেদের ভঙ্গ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ভোটবর্মী কিংবা মঙ্গোলয়েড হিসেবে আত্মপরিচয় প্রদান করতে অতিমাত্রায় আগ্রহী। এরই পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে অরেকটি পক্ষ কোচ- রাজবংশীদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করতে সক্রিয়। তারা বলতে চায় কোচ, মেচ সবই বৃহত্তর বোড়ো জনগোষ্ঠীর শাখা। তাই কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায় প্রকৃত অর্থে বোড়ো জনজাতিভুক্ত। যদিও এই মতে কোচ-রাজবংশী আন্দোলনকারীদের বা পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিদারদের তীব্র আপত্তি। কারণ কোচ-রাজবংশী তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মূল লক্ষ্য পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন। যদিও এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে।

অন্যদিকে কথ্য ভাষাকে রাজবংশী হিসেবে যাঁরা সওয়াল করছেন তাঁরা পৃথক কামতাপুর রাজ্যের সমর্থক নন--- আপাতদৃষ্টিতে এটিই বলা যেতে পারে। তবে পৃথক গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের সমর্থকদের সিংহভাগই কথ্য ভাষার নামকরণের প্রশ্নে 'রাজবংশী' শব্দ ব্যবহারে উৎসাহী। গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিদাররা হয়তো মনে করছেন এতদ্‌দেশীয় কথ্য ভাষা যদি শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে মান্যতা পায় তবে পরবর্তী জনগণনায় (সেনসাস ২০২১) তাদের প্রস্তাবিত রাজ্যসীমার অন্তর্গত জনগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী হিসাবে প্রমাণ করা সহজ হবে। অর্থাৎ তাঁরা সহজেই বলতে পারবেন প্রস্তাবিত গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের যারা অধিবাসী তাদের সিংহভাগ বাঙালি নয়, অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠীভুক্ত নন। সমস্ত বিষয়টি পশ্চাতে যে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা কেবলমাত্র কথ্য ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা পেতে আগ্রহী। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের রাজবংশী সম্প্রদায়, যাঁরা কিনা কোচ কিংবা ক্ষত্রিয় পরিচয় বহন করেন না তারা কোন্ ভাষায় কথা বলেন? তাঁদের ভাষা বাংলা নাকি আলাদা? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। যেমন অমীমাংসিত রয়েছে এখানকার কথ্য ভাষাটি বাংলার কামরূপী উপভাষা কিংবা কামরূপী বাংলা নাকি একেবারেই স্বতন্ত্র? মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলার পণ্ডিত সমাজ ১৫৫৫ সনে কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ কর্তৃক অহম রাজকে প্রদত্ত পত্রকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমনভাবে নেপালের রাজদরবারে প্রাপ্ত চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। তবে এই আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তাহলো 'কামতাপুর' নামক শব্দটির উৎপত্তির বিষয়টি। অর্থাৎ সোজা কথায় কামতাপুর বা কামতাপুরী শব্দের পটভূমি কী? আমরা জানি প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ বা রত্নপীঠ পরবর্তীতে কামরূপ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পূর্বে মানস ও পশ্চিমে করতোয়া নদী মধ্যবর্তী এলাকা কামরূপ নামে আখ্যায়িত। কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরবর্তীতে পশ্চিম কামরূপ নামে আখ্যায়িত হতে শুরু করে। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে পশ্চিম কামরূপ এলাকা পরবর্তীতে কামতা বা কামতাপুর নামে পরিচিত হয়। কোচবিহার জেলার গোসানীমারি এলাকায় যে অংশে রাজপাট ঢিপি, সেই এলাকাটি নির্দিষ্ট ভাবে ভেতর কামতা বা কামতাপুর নামে অভিহিত। প্রশ্ন হলো কামরূপ কখন থেকে কামতা হলো? ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, মুসলমান আমলের মাঝামাঝি সময়ে এ রাজ্যকে 'কামরূ ওয়া কামতা' বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সুলতানি আমলে লেখা মিনহাজ-ই-সিরাজ-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তবকাত-ই-নাসিরী'-র বাংলা অনুবাদক বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল

কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া তাঁর গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জাকারিয়া সাহেবের মতো বিশ্লেষণ করলে এরূপ মনে হয় যে, কামরূপ রাজ্যের কামতা নামকরণ দিল্লির ইসলামি শাসকরাই করেছিলেন। যেমন ভাবে ১৬৬১ সনে বাঙলার সুবেদার মিরজুমলা কোচবেহার রাজ্য দখল করে রাজধানী আঠারোকোঠার বেহারনগরীর নামকরণ করেছিলেন 'আলমগিরনগর'। পরবর্তীতে মহারাজ প্রাণনারায়ণের নেতৃত্বে প্রজাবিদ্রোহে মোগলরা বিতাড়িত হলে কোচবিহার নাম পুনরায় ফিরে আসে, 'আলমগিরনগর' নাম চিরতরে বিলুপ্ত হয়। হয়তো একই ভাবে মহারাজ বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে কামতা রাজ্যে নতুন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত কায়েম হবার পর ইসলামি শাসকদের দেওয়া কামতা বা কামতাপুর নামটির বিলোপ সাধন ঘটে এবং রাজ্যটি কুচবেহার বা কোচবিহার নামে আখ্যায়িত হতে শুরু করে। অর্থাৎ এই ভূ-খণ্ড গৌড়ের পাঠান সুলতানদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসারের মধ্যে দিয়ে বেহার, কুচবেহার বা কোচবিহার নাম ধারণ করে। যদিও বিষয়টি নিঃসন্দেহে তর্কযোগ্য। তবে এই ভূ-ভাগের স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ, যারা কিনা কোচবিহারের নারায়ণ রাজবংশের প্রভাবে হিন্দু ধর্মকে বিশেষ করে বৈষ্ণব মতবাদকে আঁকড়ে ধরে, সঙ্গে শৈব ও শাক্ত মতবাদকে নিয়ে জীবনযাপন করছিলেন তাদের একটি অংশ পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ এবং নস্যা শেখ নামে আখ্যায়িত হয়। কোচবিহারের নস্যা শেখ সম্প্রদায়ের একাংশের পৃথক কামতাপুর রাজ্য ও কামতাপুরী ভাষা নিয়ে আগ্রহ এই পর্বে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই সম্প্রদায়ের একাংশের অতি সক্রিয়তা অনেক নতুন প্রশ্নকে উস্কে দেয়।

যে বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে চাপন-উতোর কিংবা তর্ক-বিতর্ক-প্রতর্ক— তা কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। ভাষার নামকরণের প্রশ্নে রাজবংশী সমাজ ইতিমধ্যেই দ্বিধাবিভক্ত। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বৈরথ। তৈরি হয়েছে অবিশ্বাসের বাতাবরণ। পারদ ক্রমশ চড়ছে। হয়তো বা এর পরের ধাপে আসবে উত্তেজনা। অসহিষ্ণুতার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাও অসম্ভব নয়। যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে ভয়াবহ। রাজনীতিকদের কাছে যা হয়ে উঠবে শিরঃপীড়ার কারণ; বাস্তবিক অর্থে আগুন নিয়ে খেলা। মনে রাখা প্রয়োজন, 'নগরে আগুন লাগলে সুন্দর শিশু থেকে পবিত্র দেবালয় কেউ রেহাই পায় না।' এই ক্ষেত্রেও এই কথাটি প্রযোজ্য। রাজনীতিকদের এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। যাইহোক, সামগ্রিক ভাবে ভাষা সম্পর্কিত বিষয়টি রাজনীতিকদের বিচার্য বিষয় নয়, তা একান্তই ভাষাবিদদের। অতএব বিষয়টি ভাষাবিদদের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভালো। যদিও এই পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত 'রাজবংশী ভাষা আকাদেমি'র চেয়ারম্যান তথা জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয় চন্দ্র বর্মণ। তাঁর প্রশ্ন, রাজ্য সরকার গঠিত ভাষা স্বীকৃতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ভাষাবিদ কোথায়? যাঁরা আছেন তাঁর কেউ ভাষা বিশেষজ্ঞ নন। ফলে কমিটির বৈধতাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

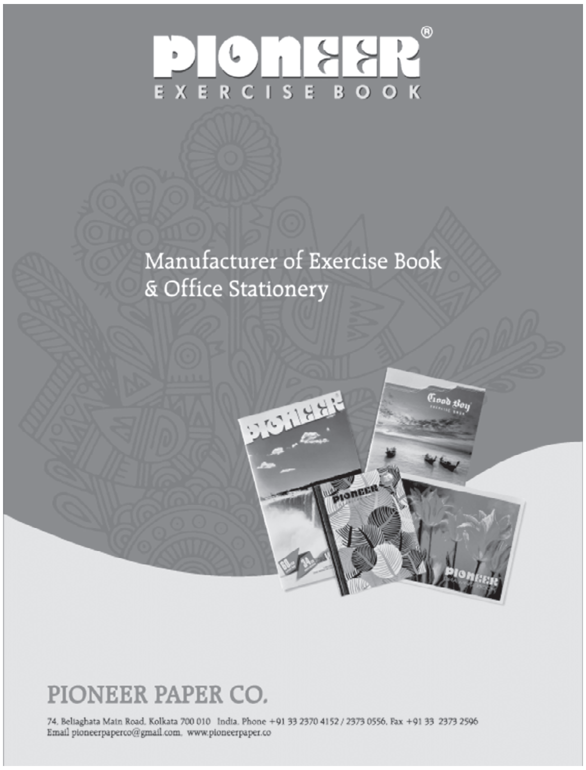

জুন ১৯৭৫ : জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুক্তিসংগ্রাম

অজিত বিশ্বাস

২৫ জুন— প্রতি বছরই ফিরে ফিরে আসে। আর তখনই মনে পড়ে জরুরি অবস্থার সময় সরকারের স্বৈরাচারিতার কথা। আর সেই একনায়কতন্ত্রী শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংস জন-আন্দোলনের সাফল্যও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সেই জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বিশ মাস ধরে গোপনে কীভাবে আন্দোলন চলেছে, বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে সেই আন্দোলনে কারা যুক্ত ছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকাই বা কেমন ছিল, তারই এক স্মৃতিচিত্র এখানে প্রকাশ করা হলো।

—সঃ স্বঃ

২৬ জুন ১৯৭৫। ভারতের ইতিহাসে একটা কালো দিন। ইন্দিরা গান্ধী নিজের গদি বাঁচানোর জন্য হঠাৎ জরুরি অবস্থা জারি করলেন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার প্রথমেই হানা দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয় ২৬ বিধান সরণীতে রাত প্রায় ১২ টার সময়।

কার্যালয়ে সঙ্ঘের কোনো অধিকারী ছিলেন না। সবাই মালদায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে (OTC) ছিলেন। জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমি ভবানীপুর কার্যালয় ছেড়ে বিধান সরণী কার্যালয়ে ছিলাম। ২৫ তারিখ আমাকে হাবড়া যেতে হয়েছিল। তাই ২৬ তারিখ রাতের ঘটনা দেখতে পারিনি। কার্যালয়ে ৬ জন ছাত্র এবং ৩ জন রুগি ছিল। সেদিন রাতে এই ৯ জনকেই থানা থেকে জেলে নিয়ে গেল। ছাত্রদের মধ্যে ছিল সুনীলপদ গোস্বামী, সনৎ বসুমল্লিক, মানিক সেন প্রমুখ। এদের সকলকেই MISA-য় ২০ মাস আলিপুর জেলে থাকতে হয়েছে।

২৭ জুন সকাল ১০ টায় আমি হাবড়া থেকে এসে ২৬ নং কার্যালয়ে যাচ্ছিলাম। একজন স্বয়ংসেবক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। উপরে যেতে বারণ করল। সব খবর তখন পেলাম।

ইতিমধ্যে জানতে পারলাম সারাদেশে একই চিত্র। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, বালাসাহেব দেওরস, মোরারজী দেশাই, এল কে আদবানী, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ নেতাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছে। সঙ্ঘ, জনসঙ্ঘ, সংগঠন কংগ্রেস ও সোশালিস্ট পার্টির সব নেতাকেই জেলে পাঠানো হয়েছে। আমাদের প্রদেশে কলকাতার নগর সঙ্ঘচালক ডাঃ সুজিত ধর, বাংলার অত্যন্ত পুরনো এবং সাহসী স্বয়ংসেবক বি এম এস-এর সভাপতি নরেশ গাঙ্গুলীকে সল্টলেকের বাড়ি থেকে জেলে নিয়ে গেছে। এছাড়া সোশ্যালিস্ট পার্টির বিমান মিত্র, দীনেশ দাশগুপ্ত, বাংলা কংগ্রেস নেতা সুশীল ধাড়া, জনসঙ্ঘের বাংলার সভাপতি হরিপদ ভারতীকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কমিউনিস্টরা (সিপিআই) ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিশ্বস্ত ও উৎসাহী সমর্থক ছিল। সিপিএমও পরোক্ষে তাই। পশ্চিমবঙ্গে

বালাসাহেব দেওরস

ইন্দিরা গান্ধী

বামফ্রন্টের একমাত্র সিপিএম নেতা জ্যোতির্ময় বসু ছাড়া আর কোনো নেতাই জরুরি অবস্থার সময় গ্রেপ্তার হননি। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারতবাসীর এই গণ-আন্দোলনে সিপিএম যোগ দেয়নি। শেষ মুহূর্তে আন্দোলনের চাপে ইন্দিরার পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পর বাইরে থেকে যোগ দিয়েছিল। ইন্দিরার পরাজয়ের কিছুদিন পরেই জনতা পার্টিকে ভাঙার তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রচার করে ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসের সহায়তা

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

EMERGENCY DECLARED

JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

Raj Narain, Mody & Chandra Sekhar held

জরুরি অবস্থা ঘোষণার খবর একমাত্র এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

করেছিল। এভাবেই সেদিন কমিউনিস্টরা স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির অংশ হিসাবে গণতান্ত্রিক মানুষের বিরোধিতা করেছিল। এটাই ওদের চরিত্র এবং আজও তাই দেখছি।

মালদায় ২৭ জুনেও OTC চলছিল। রাত্রিতে প্রদেশ সঙ্ঘচালক কেশব চক্রবর্তী প্রদেশ কার্যবাহ অমল কুমার বসু-সহ আমরা কয়েকজন সন্ধ্যায় মুনলাইট সিনেমা হলের সামনের গলিতে বিমল লাটের বাড়িতে বৈঠকে বসলাম। কী করব ঠিক করার জন্য। ২৮ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তারা কলকাতার ফিরে আসবেন। একজন স্বয়ংসেবককে বর্ধমান স্টেশনে পাঠানো হলো। সবাইকে বলা হলো, ট্রেন থেকে নেমে কলকাতা কার্যালয়ে না গিয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য।

সারা ভারতে সব প্রদেশের কার্যালয় এবং বাংলার সব জেলা কার্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। সাত দিনের মধ্যে সারা বাংলায় কয়েকশো স্বয়ংসেবককে গ্রেপ্তার করা হলো। সারা ভারতে প্রায় ৩৫,০০০ স্বয়ংসেবককে গ্রেপ্তার করা হলো। সংগঠন কংগ্রেস, সোশালিস্ট পার্টি, জনসঙ্ঘ সব মিলিয়ে আরও ১০ হাজার কর্মী ও নেতাকে MISA-তে আটক করা হলো।

সমগ্র দেশে এবং বাংলার জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টিভি, প্রেসের কণ্ঠরোধ হবার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি বিভ্রান্ত ও বিস্রস্ত হয়ে পড়লেও সঙ্ঘের পক্ষে সে বাধা অতিক্রম করা সহজতর ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সারা দেশে প্রতিদিনের শাখার মাধ্যমে প্রথম থেকেই মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্কের সহযোগিতায় সংগঠন গড়ে তুলেছে। তাই 'প্রেস' বা অন্য কোনো মঞ্চের ওপর সঙ্ঘ নির্ভরশীল ছিল না।

সঙ্ঘ বে-আইনি ঘোষণা হবার পর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুরু হলো। আশুতোষ মুখার্জী রোড (৮৪ নম্বর) কার্যালয় বন্ধ হওয়ার পর সল্টলেকে লাবণী আবাসনে একটি ফ্ল্যাট এক সাহসী বন্ধুর কাছ থেকে ভাড়ায় পাওয়া গেল। কেবল ছেলেরা থাকলে পুলিশের নজর পড়তে পারে তাই আমাকে সস্ত্রীক সেই কার্যালয়ে থাকতে হলো। জুলাই মাসের শেষে কেশব দীক্ষিত (জরুরি অবস্থার সময় নাম ছিল সুবোধ বিশ্বাস) আমার দাদা হিসেবে এবং রামচন্দ্র সহস্রভোজনী-সহ আমরা থাকতে শুরু করলাম। মাঝে অসুস্থ অবস্থায় প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট বেশ কিছু দিন এই কার্যালয়ে ছিলেন। এই ধরনের বেশ কয়েকজন স্বয়ংসেবকের বাসস্থানেই গড়ে উঠল কার্যালয়। সারা প্রদেশে এমন ভাবেই আবার যোগাযোগ আরম্ভ হলো। স্বয়ংসেবকদের বাড়িগুলিই আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনের বিশেষ স্থান। এবার শুরু হলো ভাবনা চিন্তা কীভাবে জন-আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। ১৯৭৫ সালের জুন মাসের শুরুতে সারা বাংলায় ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্য রোহণের ত্রিশতাব্দী উৎসব পালিত হয়েছিল। কলকাতায় স্টুডেন্ট হলে শিবাজীর জীবনী নিয়ে একটি চমৎকার প্রদর্শনী হলো। ৭৫টা তৈলচিত্র সেখানে ছিল। শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর ব্যবস্থাপনায় হয়েছিল সেই প্রদর্শনী। উদ্বোধন করলেন এই সমিতির সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে জানতেন এবং এর আদর্শবাদী যুবকদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে আমরা সারা প্রদেশে জনজাগরণের জন্য বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের শতবর্ষ পূর্তির একটি সমিতি গড়লাম। জরুরি অবস্থার মধ্যেও এই সমিতির সভাপতি হলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। সম্পাদক হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমিতির সভা হলো কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কক্ষে। সমিতির বাকি সবাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সেখানেই কার্যক্রম ঠিক হলো। প্রতি জেলায় কমিটি তৈরি হলো। নানা ধরনের কার্যক্রম ঠিক করা হলো। জরুরি অবস্থায় সব জেলায় জনসভা, পদযাত্রা, প্রদর্শনী, বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন পালনের কার্যক্রম করা হবে বলে স্থির হলো। ধীরে ধীরে স্বয়ংসেবক ও জনগণের ভয় ভাঙতে লাগল। অনেক জেলাতে আমাকেও যেতে

হলো। ২৬ জুন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট মূর্তি সাজানো হলো। মঞ্চ তৈরি হলো। বন্দে মাতরম্ গাইলেন মুকুন্দদাসের অভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত।

চারিদিকে মাইক দেওয়া ছিল। সভাপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। বেশ কয়েকজনের জ্বালাময়ী ভাষণ হলো। স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সঙ্গে জনগণেরও ভয় ভাঙল। এইভাবেই সেদিন জরুরি অবস্থারও বর্ষপূর্তি হলো।

জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো আন্দোলন কোনো দল করল না। এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ জেলে বসে ডাইরিতে লিখলেন— 'আমাদের এই ভারত ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত হয়ে আমার চারধারে পড়ে আছে। ভয় হচ্ছে, এখানে আবার সব কিছু গুছিয়ে ঠিক হয়েছে দেখে যেতে পারব কিনা।' চণ্ডীগড় জেলে বসে তিনি এই কথা লিখেছেন।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিল্লিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের জনসভা

চারিদিকে একটা হতাশার ভাব। এই সময় লোক সংঘর্ষ সমিতির সম্পাদক হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক এবং জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নানাজী দেশমুখ। কিন্তু কিছুদিন বাদে নানাজী দেশমুখ পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় সম্পাদক হলেন কংগ্রেসের রবীন্দ্র বর্মা। তাঁর সহকারী ছিলেন সঙ্ঘের তৎকালীন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং, মজদুর সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তোপন্ত ঠেংড়ী ও মোরোপন্ত পিংলে। সকলে মিলে সারা দেশে পরিভ্রমণ করলেন। বাংলায় প্রায় সকলেই গোপনে এসেছেন। H.V. Sechadri তাঁর বইয়ে 'RSS, Vision in Action' লিখেছেন— 'One of the crucial decision had to be taken by the Central LSS was as to whether or not a massive Satyagraha had to be launched. The snapping of communication links total black out of news silencing of the active opposition leaders under MISA. All this pointed to the hoplessness of launching any public movement. It would someone even prove to be a non starter and have a demoralising effect on the course of the movement it could only add more weapon in the propagandist armoury of the government. Even if the government was to catch on the mood of the dictator was such that she would hardly care for such public agitation. She would not mind clamping one more Lakh persons behind bars until the entire movement automatically fizzed out.

However there was the other view. The nations fighting morale was to be kept ablage at any cost. Otherwise there would he no hope for the nation other then or in future. And Satyagraha was the only way to infuge that spireit of struggle.]'

সব রাজনৈতিক দল যখন চুপ করে ছিল তখন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং আর এস এস-কে বে-আইনি ঘোষণার বিরুদ্ধে সারা দেশে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। বাংলার লোক সংঘর্ষ সমিতির পক্ষে প্রদেশের সব দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলা হলো। প্রদেশে এই সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

সব দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলা হলো। অমল কুমার বসু তখনকার কংগ্রেস সভাপতি আভা মাইতির সঙ্গে কথা বললেন, আজকের বামফ্রন্টের কোনো দল সেদিন এই সত্যাগ্রহে রাজি হয়নি। সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলার জন্য দিল্লি থেকে সমিতির নেতা সুরেন্দ্রমোহন এলেন। তিনি কথা বললেন প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে। বালিগঞ্জে শশাঙ্ক শেখর সান্যালের বাড়িতে গোপন বৈঠক হলো। প্রমোদ বাবু সত্যাগ্রহে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমাদের ১০০০ সদস্য জেলে আছে। ১০০০ সদস্য পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আমরা সত্যাগ্রহে রাজি নই। শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে একটা স্বৈরাচারী সরকারকে যে পালটে দেওয়া যায় কমিউনিস্টরা তাতে বিশ্বাস করে না'। সিপিএম নেতা এ কে গোপালন বি এম এস নেতা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীকে বলেছেন, 'আমরা যারা সারা জীবন বিপ্লবের কথা বলেছি, তারা ইন্দিরার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলাম না। যারা কখনও বিপ্লবের কথা বলেনি, সেই দক্ষিণপন্থী দল আর এস এস শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল— এটা আমাদের অবাক করেছে'।

স্থির হলো, সারা বাংলায় ১৪ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে নেহরুর জন্মদিনে সত্যাগ্রহ শুরু হবে। কলকাতায় সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বংশীলাল সোনীর ওপর।

প্রথম সত্যাগ্রহ শুরু হলো ১৪ নভেম্বর প্রেস ক্লাব থেকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে

১৫ জনের একটা দল ধর্মতলা চত্বরে সত্যাগ্রহ করল। কাউকেই পুলিশ ধরল না। প্রফুল্ল সেনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল পুলিশ। তারপরে ২ মাস ধরে সারা প্রদেশে সব জেলা কেন্দ্রে সত্যাগ্রহ হলো। কলকাতা শহরে ৩৫০ জন স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করল। সবাইকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। ৯ ডিসেম্বর আমি সত্যাগ্রহ করলাম ১১ জন স্বয়ংসেবককে নিয়ে। ক্যানিং স্ট্রিট থেকে আমাদের মিছিল শুরু হলো। নেতাজী সুভাষ রোড দিয়ে এগিয়ে চললাম। স্লোগান ছিল 'ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত ভেঙে দাও, আর এস এস-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও'। মাঝে ৩টি স্থানে বক্তৃতাও দিলাম। তখনও পুলিশ আসেনি। সত্যাগ্রহীরা ছাড়াও অনেকে পাশে পাশে হাঁটছিল। দেখলাম সবাইকে শেষে পুলিশ আটকালো Bank of Maharastra-র সামনে। আমাদের নিয়ে গেল লালবাজারে। সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। প্রায় ১ মাস ধরে সত্যাগ্রহ চলল। শেষে বংশীলাল সোনী নিজেও একটি দল নিয়ে সত্যাগ্রহ করলেন

জেলের ৩টি সেলে আমাদের ৩০০-র ওপরে সত্যাগ্রহী ছিল।

জেলে গিয়ে দেখা হলো সবার সঙ্গে। নরেশ গাঙ্গুলী ছিলেন গোরা বিভাগে সোশ্যালিস্ট ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। ২৬ জুন থেকে সবাই জেলে ছিল। নেতারা ছিলেন নিরাশ। প্রায় ৫ মাস কোনো আন্দোলন ছিল না। নরেশদা বাইরের খবর পেতেন। আর এস এস সত্যাগ্রহ করবে এই খবরও পেলেন। নেতাদের বললেন, 'জেল ভরে যাবে সত্যাগ্রহীতে'। নেতারা নরেশদাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাসা করতেন। যেদিন প্রথম সত্যাগ্রহীর দল জেলে গেল 'ভারতমাতা কী জয়' স্লোগান দিয়ে নরেশদা তখন নেতাদের ছেড়ে সাধারণ স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে থাকতে এলেন। নরেশদা সকলের সামনে বলতেন, 'যেদিন ইন্দিরা জেলে যাবে আমি সেদিন ছাড়া পাব'।

সত্যাগ্রহী কারাগৃহকে গুরুগৃহ বানিয়েছিল। আলিপুরে জেলে প্রায় ৩০০ সত্যাগ্রহী স্বয়ংসেবক ছিল। প্রায় ২০০ জন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছিল। জেলে সকালে প্রথমে শারীরিক কার্যক্রম-সহ শাখা হোত। তারপর পড়াশোনার ক্লাস হোত। ৮ জন স্বয়ংসেবক ছিল সি এ পরীক্ষার্থী। পরবর্তীকালে যারা প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট হয়েছে। জেলে গিয়ে দেখা হলো আনন্দবাজারের সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ এবং বরুণ সেনগুপ্তের সঙ্গে।

সারা ভারতে প্রায় ১ লক্ষ স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। স্বাধীনতার কোনো আন্দোলনে এত মানুষ জেলে যায়নি। সারা বাংলায় প্রায় ৩৫০০ স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করেছিল।

সত্য সমাচার

মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টিভি, প্রেসের কণ্ঠরোধ করার ফলে সাধারণ মানুষ কোনো সঠিক সংবাদ পেত না। তাই প্রতি ১৫ দিন অন্তর 'সত্য সমাচার' নামে একটি বুলেটিন' প্রকাশ করা হোত। বেলেঘাটায় একটি ছোট প্রেস থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই বুলেটিন প্রকাশিত হোত। প্রচারক গণেশ দেবশর্মার সম্পাদনায় প্রকাশ করা হোত এই বুলেটিন। সমস্ত জেলায় তা পাঠানো হোত। প্রতিটি খবরের কাগজের অফিসে, সব রাজনৈতিক দলের অফিসে, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং নেতাদের পাঠানো হোত এই সব বুলেটিন। মানুষ আগ্রহে অপেক্ষা করত ওই বুলেটিনের জন্য। প্রথমে সব দলের নেতারা হাতে হাতে নিত এই বুলেটিন। আমাদের স্বয়ংসেবকরা এই কাজ করত। কিছু বিপ্লবী দলের নেতা শেষের দিকে হাতে হাতে নিতেও ভয় পেত। আমরা তখন Letter Box-এ ওই বুলেটিন রেখে আসতাম।

ছোট ছোট বুকলেট ছাপা হয়েছে। শিয়ালদা অঞ্চলের শশীভূষণ দে স্ট্রিটের এক মহিলার প্রেসে ছাপতে দিলাম সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর লেখা 'জরুরি অবস্থা অর্থনীতি' নামে একটি ছোট ইংরেজি বই। ৩২ পাতার বই ছাপা যেদিন শেষ হলো সেদিন প্রেসে এলেন একজন পুলিশ অফিসার মোটর সাইকেলে। পরে জানলাম তিনি প্রেসের মালিক মহিলার স্বামী। পুলিশরাও অনেক সহযোগিতা করেছেন। পাশের ঘরে নিয়ে আমায় বললেন, 'এই সব বই ছাপানো বেআইনি। এর ফল কি জানেন? যাক, আজকেই ছাপা বই এখান থেকে নিয়ে যান।' সেই সব ছাপা ফরমাগুলো নিয়ে পাশের একটা বাইন্ডিংয়ের দোকানে দিলাম। রাতারাতি সেই ১০০০ বই বাঁধিয়ে দিল।

জরুরি অবস্থার সময় সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। গোপনে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন। দেশে ফিরে ১০ আগস্ট ১৯৭৬ রাজ্যসভায় নিজের উপস্থিতি জানিয়ে আরও অদ্ভুতভাবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। পরে আবার তাঁকে বিদেশে দেখা গেল। স্বামী জরুরি অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েননি। কারণটা স্বামী পরে বলেন, 'The diference why George Farnandes was caught and I was not, was because of RSS.' স্বামীর এই বই আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে সাংবাদিকের কাছে বিক্রি করেছিলাম।

জেলের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষকে দিয়ে ৩টি খোলা চিঠি লেখানো হলো। জেল থেকে সেই চিঠি বের করে নিয়ে ছাপিয়ে সারা প্রদেশে ছড়ানো হলো। ইংরেজি করেও সারা দেশে বিলি করা হয়েছিল।

লালকৃষ্ণ আদবানী ব্যাঙ্গালোর জেলে ছিলেন। সঙ্গে অটলজী, কংগ্রেস নেতা শ্যামনন্দন মিশ্র-সহ আরও অনেকে ছিলেন। আদবানীজী তাঁর বই— My country My life-এ লিখছেন, 'Ironically, the only reliable source of information those days were the BBC, voice of America, Voice of Germany and Radio Australia. These were the four foreign stations that my small transistor could catch, besides of course, Radio Moscow which worked more like the overseas propaganda organ of Indira Gandhi's government.'

রাশিয়ার দালাল কমিউনিস্টরা ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের সক্রিয় সমর্থক ছিল। রাশিয়া এদেশে সক্রিয় দালাল তৈরি করার জন্য কংগ্রেসের সাহায্য ও সহযোগিতায় গড়ে তুলেছে দিল্লিতে জে এন ইউ (Jaharlal Nehru University) ১৯৬৯ সালে। সেই জে এন ইউ-র সকল অধ্যাপক ও ছাত্র সারা দেশের কমিউনিস্ট পরিবার থেকে নেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্টদের সাহায্য নিয়েই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান গড়ে তুলেছেন আই সি এইচ আর (Indian Council of Historical Research), যার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে

বই লিখেছে। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। আজকের সি পি এম সম্পাদক প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট নেতা প্রচণ্ড এই জে এন ইউ-র ফসল।

১৯৭৬ সালের মে মাসে ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে ভূদান আন্দোলনের নেতা বিনোবা ভাবে সারা ভারতের উপাচার্যদের (ভি.সি.) দিয়ে শিক্ষাবিদদের একটি সম্মেলন ওয়ার্ধার আশ্রমে ঠিক করেছিলেন। বিনোবা ভাবে তখন জরুরি অবস্থার কালকে অনুশাসন পর্ব বলে প্রচার করছিলেন। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ঠিক হলো এই সম্মেলনে প্রচার অভিযান চালানো হবে। সব প্রদেশ থেকে সব জেলের খবর নিয়ে বিনোবা ভাবেকে দেওয়া হবে। কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলে যেসব বন্দিরা রয়েছে তাদের লিস্ট নিয়ে আমি নাগপুর গেলাম। সেখানে স্টেশন থেকে একজন একটি বাড়িতে নিয়ে গেল।

সেখানেই দেখা হলো আবাজী থাট্টের সঙ্গে। যিনি পূজনীয় শ্রীগুরুজী ও মাননীয় বালাসাহেব দেওরসজীর আপ্ত সহায়ক ছিলেন। তিনিই সব বোঝালেন বিনোবাজীর কাছে কীভাবে যাবো এবং কী কী বিষয়ে কথা বলব। ওয়ার্ধায় বিনোবাজীর কাছে বন্দিদের সব লিস্ট দিলাম। জরুরি অবস্থায় বাংলার সব অত্যাচারের কথা বললাম। সেদিন তাঁর নীরবতা পালনের দিন ছিল। সব কথা শুনলেন। আশ্রমে তখন নির্মলা দেশপাণ্ডে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও অনেক কথা হলো।

আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইজরায়েলের এবং অন্যান্য দেশের অনাবাসী ভারতীয়রা সমবেত ভাবেই স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। ইন্দিরা সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জরুরি অবস্থার পক্ষে সওয়াল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা দু'একবার গিয়ে আর যেতে চাননি। যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হোত সে সবের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। অনাবাসী ভারতীয়দের আন্দোলোনর ফলে আন্তর্জাতিক জগতের সামনে স্বৈরতন্ত্রের মুখোশ খসে পড়েছিল।

ইন্দিরা সরকার ভীষণ চাপে পড়ে গেল। আত্মগোপন করে লোক সংঘর্ষ সমিতির কার্যকর্তারা বিভিন্ন কর্মধারা দেশের প্রতি প্রান্তে নানা ভাবে প্রচারিত করতে লাগলেন। অগণিত লেখালেখি জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারিতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। সরকার যেভাবে পরিস্থিতি সামলে নেবে ভেবেছিল তা আদৌ হলো না।

১৯৭৭-এ নির্বাচন ঘোষণার আগে সংগ্রামীদের অনেকের মনেই চিন্তা, কিছুটা হতাশার ভাব দেখা যাচ্ছিল। তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস ইয়ারবেদা জেল থেকে তাদের উৎসাহিত করে সে সময় বলেছিলেন— 'স্থির থাকুন। ভীত হওয়ার কারণ নেই। আমরা এই দুর্যোগ থেকে সগৌরবে উত্তীর্ণ হবো। কবে কখন তা এখন বলতে পারছি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত— এ হবেই।'

তখন নির্বাচন দু'সপ্তাহ বাকি, ১৯৭৭, মার্চের প্রথম সপ্তাহ। সরকারের অতি উচ্চপদস্থ এক অফিসার সঙ্ঘের পাঁচজন নেতার সঙ্গে গোপনে দেখা করে বললেন, সঙ্ঘের ওপর থেকে বেআইনি আদেশ তুলে নেওয়া হবে, যদি স্বয়ংসেবকরা নির্বাচনী সংগ্রাম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। নির্বাচন ঘোষণা করে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হলেও সঙ্ঘের ওপর থেকে বে-আইনি আদেশ প্রত্যাহার তখনও হয়নি। সেই অফিসারকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল— 'তা হবে মানুষকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছিয়ে যাওয়া। সঙ্ঘ বে-আইনি থাকতে ভয় করে না। দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা না করাকে ভয় করে।' সেই অফিসার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ধীর শান্ত স্বরে বললেন, 'জানতাম আপনারা এই-ই বলবেন। আপনাদের কথায় গর্ব অনুভব করি।'

১৯৭৭ সালের লোকসভার নির্বাচনে এক সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট ছিল। পশ্চিমবাংলায় সেই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ১৪টি আসনে লড়াই করেছিল। বাকি সব আসনে জনতা দলের প্রার্থী ছিল। পশ্চিমবাংলায় সিপিএম দল সেদিন গর্তে ঢুকে পড়েছিল। যাদের সংগঠনের মূলমন্ত্র হলো 'বিপ্লব', সেই দল লোকসভা নির্বাচনে রাস্তায় বেরিয়ে নির্বাচনে প্রকাশ্যে কাজ করতে ভয় পাচ্ছিল। লোকসভা নির্বাচনে সারা বাংলায় সিপিএমের সমস্ত কেন্দ্রে স্বয়ংসেবকরা নির্বাচন সামলেছে। হাওড়া কেন্দ্রে সিপিএম নেতা সমর মুখার্জীর নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। বাংলার সর্বত্র লোকসভা নির্বাচনে এই চিত্র ছিল। এর ফলে সারা বাংলা কেবল নয়, '৭৭-এর সেই লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত একটি আসনও কংগ্রেস পায়নি। রায়বেরিলি থেকে ইন্দিরা এবং আমেথি থেকে সঞ্জয় গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো। সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। এই গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সিপিএম স্বৈরতন্ত্রের পথে চলেছে। কংগ্রেস তাকে ১৯৭৫ সালের মতো আজও সাহায্য করে চলেছে। ■

সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এই সময়

পেঁচার সাঁতার

পেঁচাকে কখনও সাঁতার কাটতে দেখেছেন? আমেরিকার লেক পাওয়েলের ফেস

ক্যানিয়নে এমনটাই ঘটেছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন বাসা থেকে জলে পড়ে যাওয়ায় পেঁচাটির সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

মার্জার-সিংহ কথা

বলা হয় বেড়াল নাকি কাউকেই ভয় করে না! সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে

টেক্সাসের অ্যানিম্যাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনে। সেখানে ব্যাগি নামের একটি পোষা বেড়াল খাঁচায় বন্দি একটি সিংহকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তাদের দ্বন্দ্ব-লড়াই ক্যামেরাবন্দি করে ইউটিউবে প্রকাশ করেছেন ডেরেক ক্রাহন।

গাড়ি নিয়ে দোকানে

পার্ক করতে অযথা সময় নষ্ট হয় বলে এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে সরাসরি দোকানে ঢুকে

পড়লেন। চীনের পিপলস ডেইলির ফেসবুক পেজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। দোকানের সিসিটিভিতেও ধরা পড়েছে ঘটনাটি।

সমাবেশ -সমাচার

ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্‌ঘাটন

ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর নামে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র শুরু হলো কলকাতা মহানগরের ১০ নং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্‌ঘাটন করেন। গ্রাম থেকে আগত রোগীদের থাকা, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা-সহ রক্ত, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, গাইড ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা করা হবে এই কেন্দ্র থেকে। পূর্বাঞ্চল জনকল্যাণ

সমিতির তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্রটি চলবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী।

কেন্দ্রের সম্পাদক ললিত তোদী জানান, জাতীয় স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে আমাদের সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদের শিক্ষিত ও সংস্কারিত করে তোলাই এই স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সেবাকেন্দ্রের উদ্‌ঘাটন করেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। পরে উপস্থিত সকল অতিথিকে আপ্যায়ন করা হয়।

দক্ষিণেশ্বরে স্বামী অভেদানন্দ সার্ধশত বার্ষিকী উপলক্ষে সভা

স্বামী অভেদানন্দের সার্ধশতবার্ষিকীর অঙ্গ হিসেবে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উদ্যোগে গত ৪ জুন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের রূপকার স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের আবাস উত্তর কলকাতার নিমু গোস্বামী লেনের বাড়ি থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে। অসংখ্য ভক্ত সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তীর্থ পরিক্রমার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে উজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা স্থানগুলি দর্শন করেন এবং দুপুরে মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকেলে এক ধর্মসভায় ভবতারিণী মন্দির ট্রাস্টের অছিপরিষদের সম্পাদক কুশল চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের পরে স্বামী অভেদানন্দ যে ভারতের সনাতন দর্শন বেদান্তকে মার্কিন মুলুকে যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন তার তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন।

বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দ এবং বিশিষ্ট তাত্ত্বিক অভিজিত সরকার বর্তমান বিশ্বসভ্যতার প্রেক্ষিতে বেদান্তের সর্বজনীন আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতার কথা তুলে ধরেন যুক্তি ও বিচারবোধের মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠানে বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট সদস্যরাও নিজ চিন্তা ও কর্মের অভিজ্ঞানে এক অনন্য মাত্রা সঞ্চার করেন।

এই সময়

হাতেনাতে

মলের রক্ষীদের নজর এড়িয়ে পছন্দসই জিনিসপত্র দিব্যি ব্যাগে ভরছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ধরা পড়ার পর তেইশ

বছরের ছাত্রীটি জানিয়েছেন তিনি ক্লেপটোম্যানিয়ার গবেষক। গবেষণার স্বার্থেই এই চুরি। পুলিশ বিশ্বাস করেনি। তার বাড়িতেও মিলেছে চোরাই মাল। ঘটনাটি আমেরিকার ইয়োমিং প্রদেশের।

পঞ্চাশে রঙ

পারিভাষিক নাম এনক্রোমা। বাংলায় বর্ণান্ধতা। ক্রিস স্মেলসার আজন্ম বর্ণান্ধ। পঞ্চাশতম জন্মদিনের উপহার হিসেবে ক্রিসকে বিশেষ এনক্রোমা সানগ্লাস উপহার দিল তার পরিবার। এই গ্লাস ব্যবহার করলে রঙ দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। রঙিন দুনিয়া দেখে ক্রিস অভিভূত।

আদর্শ কিষান বাজার

মধ্যপ্রদেশে আদর্শ কিষান বাজার গড়ে তোলা হবে যেখানে কৃষকেরা তাদের ফসল

সরাসরি বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া, কৃষকেরা যাতে কৃষি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পান তার জন্য গ্রামে-গ্রামে গড়ে তোলা হবে তথ্যকেন্দ্র। খবরটি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান।

সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার বার্ষিক বৈঠক

গত ২৮ মে সমবেত ভাবসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার বার্ষিক বৈঠকের প্রথম কালাংশের সূচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুজিত চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৃথীশ পত্রনবিশ। সভাপতিত্ব করেন সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল। বৈঠকে রাজকুমার মিস্ত্রি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। কোষাধ্যক্ষ পরিমলেন্দু সরকার বাৎসরিক আয় ব্যয়ের তথ্য পাঠ করে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। কবি, সাহিত্যিক শশাঙ্ক শেখর মৃধাকে উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন ভরত কুণ্ডু। রাষ্ট্রপতি

পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক, কবি-লেখক যামিনী রঞ্জন প্রামাণিককে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন সুজিত চক্রবর্তী। যাত্রাপালাকার দুলাল চন্দ্র মণ্ডলকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন পৃথীশ পত্রনবিশ। সভাপতি বিগত ২০১৬-২০১৭-র কার্যকারী কমিটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভরত কুণ্ডু ২০১৭-২০১৮-র নতুন সমিতি ঘোষণা করেন : উপদেষ্টা মণ্ডলী : সর্বশ্রী শশাঙ্ক শেখর, মৃধা, পৃথীশ পত্রনবিশ, তরুণী দত্ত, সুষেন কুমার রায়, আলি আকবর বাউল, গোপাল দাস বাউল, ভবতোষ দাস ও অমিত ঘোষ দস্তিদার। সভাপতি : বুদ্ধদেব মণ্ডল। সহ-সভাপতি : নিত্য সরকার। সম্পাদক : পরিমলেন্দু সরকার। সংগঠন সম্পাদক : শেখর মণ্ডল। মাতৃশক্তি সম্পাদকীয় : শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়। সদস্যা : শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল। নাট্য সম্পাদক: অজয় হালদার। সহ-সম্পাদক : রাধারমণ মণ্ডল। সঙ্গীত সম্পাদিকা : শান্তি বৈদ্য। সহ-সম্পাদক : সুমন সরকার। অঙ্কন সম্পাদক : ধনঞ্জয় মণ্ডল। সহ সম্পাদক : রাখী মণ্ডল। বাচিক সম্পাদক : প্রমোদ রঞ্জন মণ্ডল। সহ-সম্পাদক : দুলাল চন্দ্র মণ্ডল। নৃত্য সম্পাদক : প্রদীপ মণ্ডল। সহ-সম্পাদক : শ্রীপর্ণা মণ্ডল।

দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দুলাল চন্দ্র সাঁফুই। সুমন সরকার ও স্বস্তিকা রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় সঙ্গত করেন অমল নস্কর, মেঘনাথ দাস ও স্বপন বিশ্বাস। পারকাশনে ছিলেন অলোক কর্মকার, তিনি সানাই পরিবেশন করেন। গানের মাধ্যমে শরীর চর্চা ও জিমনাস্টিক পরিবেশন

এই সময়

দুই পাক সেনা হত

নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে ভারতীয় সেনার গুলিতে অন্তত দু'জন পাক

সৈন্য মারা গেছে। সম্প্রতি একদিনে তিনবার পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলে ভারতীয় সেনা তার জবাব দেয়। তাতেই মারা যায় দু'জন সৈন্য।

পাহাড় জ্বলছে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই বলেন পাহাড় হাসছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেবার অভিযোগে সম্প্রতি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং পুলিশের সংঘর্ষে

পাহাড়ের কোথাও হাসি আর চোখে পড়ছে না। পাহাড় এখন জ্বলছে। আতঙ্কিত পর্যটকেরা পাহাড় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

ঠাকুমার কাছে নাতনি

সেরা নাতনির জন্য যদি কোনো পুরস্কার থাকত তাহলে সেটা অবশ্যই শেলবি হেনিক পেতেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঠাকুমা

পোষা কুকুরটিকে দেখতে চান। তাই শেলবি পোশাকের নীচে কুকুরটিকে লুকিয়ে এনে ঠাকুমাকে দেন। অস্ট্রেলিয়ায় ঘটেছে ঘটনাটি।

করে সকলকে মোহিত করেন কুমারী গরবিনী মণ্ডল। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন দুলাল মণ্ডল, যামিনী রঞ্জন প্রামাণিক। ছোট ছোট শিল্পীরা রবীন্দ্র নৃত্য, ভাওয়াইয়া, লোকগীতি পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। অদ্রিজা মণ্ডল, সঙ্গীতা মণ্ডল, সুচিত্রা রায়, বৈশাখী মণ্ডল, নেহা মণ্ডল, মাফুজা পারভিন, তাম্মানা পারভিন, পৃথা মণ্ডল-রা সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রদ্ধা'র ৮৯তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১১ জুন সিউড়ী সেহাড়াপাড়া নিবাসী ৮৬ বছর বয়স্ক সত্যনারায়ণ প্রসাদ কেশরীকে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ওঙ্কার, শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্রদ্ধা'র সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গায়ক ও গীতিকার বিমল সোম। কেশরী মহাশয়কে হাত-পা ধুইয়ে ফুল, তুলসী, চন্দন দিয়ে বন্দনা করেন তাঁর নাতনি কুমারী পূজা কেশরী।

মানপত্র পাঠ করেন কৃষ্ণেন্দু ঠাকুর। বক্তব্য রাখেন ইউ পি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শ্রদ্ধার অনুভবী সদস্য শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র। সিউড়ী শহরের বিশিষ্ট গায়িকা শ্রমতী অলকা গাঙ্গুলী নজরুলগীতি পরিবেশন করেন।

অর্ঘ্য স্বরূপ ভাগবদগীতা, পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল, মিষ্টান্ন শ্রীকেশরীকে নিবেদন করা হয়। তাঁর পুত্র সুদর্শন কেশরী হিন্দিতে স্বরচিত ভজন পরিবেশন করেন ও বক্তব্য রাখেন। দেবাদিত্য চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য সোম সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন 'শ্রদ্ধা'র পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

সিউড়ী সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিভার অন্বেষণে সিউড়ী সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সিউড়ীর সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে গত ১০ ও ১১ জুন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন-সহ বিভিন্ন বিষয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ন'শোর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি, আধুনিক, ভজন এবং রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য সহ মোট ১৪ টি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম জেলা ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রতিভাবান প্রতিযোগীদের আগামী ২৭ আগস্ট সংস্কার ভারতীর সিউড়ী শাখার বার্ষিক উৎসবে পুরস্কৃত করা হবে। ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় শিশু-কিশোররা নিবেদিতার ছবি এঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। বিশিষ্ট সঙ্গীত গুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী নিমাই দাস, আবৃত্তিকার সদানন্দ মণ্ডল, নৃত্যশিল্পী তমালিকা বসু, গার্গী দাস প্রমুখ বিচারকের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, গত ১২ বছর ধরে প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের প্রচারের আলোয় তুলে আনার জন্যই আমরা জেলাব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি। শাখার সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন— জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগির অংশগ্রহণই আমাদের উৎসাহ জাগায়।

অতিথি কলম

দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ফেরানোয় সফল মোদী সরকার

এম. জে. আকবর

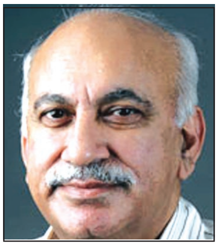

এম জে আকবর

কথাটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় প্রবাদ সমতুল যে সরকারের সময়কালের অর্ধাংশই অপব্যয় হয়ে যায়। কেউই কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানে না নষ্ট হয়ে যাওয়া এই অর্ধাংশ মোট সময়কালের কোন অর্ধাংশ। দীর্ঘ হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার ফলে ভারতীয় ভোটদাতারা চট করে বিশ্বাসই করেন না যে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে ব্যগ্র। কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে একটি জাতীয় সরকার যার কাজের নির্দিষ্ট অভিমুখ রয়েছে, রয়েছে কাজের গতি ও সদিচ্ছা, সেই সঙ্গে যে সরকার আত্মবিশ্বাসী ও কর্তব্যনিষ্ঠ, তখন যে নির্বাচনী রসায়নের কথা বার বার বলা হয় তা আর রসায়ন না হয়ে লোহা থেকে সোনা তৈরির জাদুবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

২০১৪ সালের নির্বাচনে মানুষের চরম হতাশাক্রান্ত থাকার পর্যাপ্ত কারণ ছিল। ১০ বছর ধরে দেশের কোনো বাড়বৃদ্ধি না হওয়া শুধু নয়, চূড়ান্ত দুর্নীতি প্রায় বিস্ফোরণের সীমায় পৌঁছেছিল। এমন একটা হাল ছাড়া পরিস্থিতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি উদাসীনতার সঞ্চার হয়েছিল। রাজনীতিবিদদের থেকে তাদের আশা করার কিছু ছিল না। তারা ছিলেন নির্মোহ। চূড়ান্ত হতাশার সহোদর হিসেবে বা ইংরেজিতে যাকে 'by-product' বলে তা থেকে জন্ম নিয়েছিল জনক্রোধ। দীর্ঘ আট মাস ব্যাপী তাঁর সম্মোহনী নির্বাচনী প্রচারে দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত এই আশাহীনতা ঝেড়ে ফেলে মানুষকে নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী।

এখন সমস্যা হচ্ছে— এমন একটা অবস্থা থেকে পরিবর্তন তো জাদুমন্ত্রে আসে না। হতবুদ্ধিকর বিরোধী দলগুলি তড়িঘড়ি প্রত্যাঘাত করতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে— কোথায় পরিবর্তন? তাদের এই আক্রমণের তীব্রতা থেকে বোঝা যায় তারা নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে কতটা উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত। তিন বছরের মধ্যেই মানুষের হৃতবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নতম স্তরে আত্মবিশ্বাস পুনঃসঞ্চারিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল এই সাফল্য মাপার কাজে ব্যারোমিটারের কাজ করেছে। কিন্তু যে সব জায়গায় এর মধ্যে নির্বাচন হয়নি বা আসন্নও নয় সেখানে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। এই মুহূর্তে হয়তো কোনো ঝড় বইছে না কিন্তু হাওয়ার গতিতে কিছু চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে।

একটা ক্যুইজের খেলা শুরু করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের কোন অংশ স্বাধীন ছিল না? উত্তর— তৎকালীন বঙ্গের মালদহ। ১৫ থেকে ১৭ আগস্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের এই মধ্যবর্তী দু'দিন তখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাওয়া (পূর্ববঙ্গ থেকে) একজন প্রশাসক দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। অন্য কিছু অঞ্চল যেমন হায়দরাবাদ বা ইউরোপের অন্য দেশের কলোনি গোয়া এগুলির কথা এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। এগুলি সে অর্থে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই ক্ষেত্রে যুক্তি ছিল জনচরিত্রের বা ধর্মের। মালদা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমানা-যুক্ত গঙ্গা বিধৌত একটি অঞ্চল। মালদার স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। পৌরাণিক ইতিহাসে এই অঞ্চলকে গৌড় বলা হয়েছে যা ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। পাল রাজাদের সময় পর্যন্ত গৌড়ই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এর পর গৌড় যায় দিল্লির সুলতান ও পরবর্তী সময়ে মুঘলদের হাতে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন থেকেই মালদা ছিল কংগ্রেস-নিষ্ঠ। এর মধ্যে গত এপ্রিল মাস নাগাদ একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে আমাকে মালদা শহরের অদূরে গাজোল নামের একটি ছোট মফস্সল শহরে যেতে হয়েছিল। এখানকার মানুষজন অধিকাংশই কৃষিজীবী। অমাদের সভায় ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল বললে ভুল বলা হবে। আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যাওয়া শ্রোতাদের সংখ্যা হাজার দু'য়েকের মধ্যে ছিল। বাঙালি ভোটদাতারা বরাবরই ভোট নিয়ে মন খুলে আলোচনা, উচ্ছ্বাস করতে অভ্যস্ত। তবে যাই করুন না, তাঁরা সময় নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেন। মানুষের মনের মধ্যে চিন্তাভাবনার পরিবর্তনগুলিকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় জনসভার মঞ্চটি আদর্শ স্থান। শ্রোতার মন-মর্জি বোঝার সূচক হিসেবে ঘনঘন মাথা নাড়া, চোখের ঘননিবদ্ধ দৃষ্টি, মৃদু সম্মতি জ্ঞাপক হাত তোলা বা সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর সূচক তুমুল হর্ষধ্বনি। এই সভায় গিয়ে আমার ধারণা হয়েছিল আর একটি আবর্ত তৈরি

হয়েছে। মাটি কাঁপছে। কিন্তু সেই কম্পন বা আবর্তজনিত অস্থিরতা কতদূর প্রসারিত হতে পারবে তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে ঘোষণা করা যাবে না, কেননা এর সঙ্গে যোগ হবে আরও অনেক নজরে না পড়া বিষয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে মালদা যদি টলে যায় তাহলে কোনো শক্ত ঘাঁটিই আর তত শক্ত নয়।

পক্ষপাতহীনভাবে বলতে গেলে ভোটদাতাদের পছন্দের স্থিরতা নিরূপণ করা বেশ গোলমেলে কাজ। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির গতিবিধি, পারস্পরিক আয়ের বৈষম্য ও প্রতি নিয়ত বেড়ে চলা আকাঙ্ক্ষা। কোনো গোষ্ঠীর প্রতি উগ্র সমর্থন বা তার প্রতি বরাবর অনুগত থাকার বিষয়টি বড় ভূমিকা অবশ্যই পালন করে। কিন্তু সাত দশক ধরে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলা অচলায়তনে আজ যেন ফাটল ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। এর প্রাথমিক কারণ দুর্নীতি। এই দুর্নীতিজনিত আক্রোশ পেছন থেকে ক্রমশই সামনের দিকে অগ্রসরমান। টেলিভিশনের পর্দায় প্রায়ই দৃশ্যমান হওয়া শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের অক্লেশে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পকেটস্থ করে নির্বিকল্প অবস্থায় থাকাটা বাংলার মানুষের মধ্যে চাপা আগুনের মতো ধিক ধিক করছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সর্বদাই উচ্চ নীতিগত অবস্থানের কথা আউড়ে যান, মানুষ তাঁর কাছ থেকে এইসব নেতা-মন্ত্রী-সাংসদের ঘুষ নেওয়া সমর্থন করার মতো অনৈতিক কাজ মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। পরিব্যাপ্ত দুর্নীতির এই আবহে ভোটদাতাদের অনেকেই কানে শোনা কথাটা— নেতার নিকট-আত্মীয়স্বজন রাতারাতি উজির বনে গেছে— সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তার মূলেও রয়েছে এই দূষিত টাকার খেলা। ওই টিভি-চিত্রগুলি জনতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মনে করছে। তিনি এখন খোলাখুলি অসততার সংস্কৃতি বাংলায় চালু করে দিলেন। বাজারে এমন একটা কথা স্বীকৃত সত্যের পর্যায়ে চলে এসেছে যে বিমুদ্রীকরণ নিয়ে তাঁর অত লম্ফঝম্ফ কেবলই তাঁর গচ্ছিত গাদাগাদা কালোটাকার বাতিল হয়ে যাওয়াজনিত হতাশা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। ২০১৪ সালের নির্বাচন ছিল 'গেম চেঞ্জার।' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে খেলাটা ছিল সেমি ফাইনাল। ফাইনাল ২০১৯-এ। আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যাচ্ছে তাবড় তাবড় বিরোধী নেতারাও যেন পিচ্ছিল জমিতে আটকে যাচ্ছেন।

কংগ্রেস দল তো নিজেদের যাকে বলে in-laws অর্থে আত্মীয়স্বজন আর out-laws অর্থাৎ বেআইনি কাজ করতে অভ্যস্ত লোকজনদের নিয়ে পরিবারতন্ত্রের ঘেরাটোপেই নিজেদের আটকে রেখেছে। এর মধ্যে National Herald পত্রিকার তহবিল তছরূপ করার মামলায় মা-ছেলে অর্থে দলের সভাপতি, সহ-সভাপতি দু'জনেই জামিনে মুক্ত আছেন। আর এক বর্ষীয়ান নেতা লালুপ্রসাদ ইতিমধ্যেই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগগুলির পুনঃতদন্তের আদেশ দিয়েছে আদালত। এতে না দমে লালু তাঁর ছেলেপুলেদের অসৎ কাজে নামিয়ে দিয়েছেন। তাঁরাও গরিবগুর্বো বা স্বার্থান্বেষী মানুষদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নাকি উপহার হিসেবে হস্তগত করছেন। নানা বেআইনি ভুতুড়ে কোম্পানির সঙ্গে তারা লেনদেনে লিপ্ত। মায়াবতীর বিশ্বস্ত কমরেড নাসিমউদ্দিন সিদ্দিকি তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আসন বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা তোলার মতো সাংঘাতিক অভিযোগ এনেছেন। দিল্লি সরকারের একজন প্রবীণ মন্ত্রী কপিল মিশ্র চুরির অভিযোগে সততার ছদ্মবেশী কেজরিওয়ালের হাড়মাংস নিয়ত আলাদা করছেন। এই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁরা অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই দেখে যে পারস্পরিক পিঠ চুলকানির দিন আর নেই; কেউই আজ আইনের উর্ধে নয়।

বিজয় মাল্যর মতো রঙিন মানুষ এখন হতবাক হয়ে আবিষ্কার করছেন যে টাকা ফেললেই প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় না। টাকা আইনকে কিনতে ব্যর্থ হচ্ছে। ভোটদাতারা এই কারণেই বিমুদ্রীকরণকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা বুঝেছিল বড়লোকের অচল টাকাও আর সচল করা যাবে না। এসবের সঙ্গে মানুষ দেখছে এই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির তিলমাত্র অভিযোগ নেই যা কংগ্রেসি জমানার ১০ বছরের বিপরীতে প্রায় আলোআঁধারের খেলা বলেই মনে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে কাজ করে যাওয়ারই আর এক নাম সুশাসন। এর পরিণতিতে সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য চরম দরিদ্রদের উত্তরণ ঘটানোর কাজ ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। গরিব জনতা এখন বিশ্বাস করছে দুর্নীতি আসলে তাদেরই টাকা চুরি করে নেওয়া। সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগের ফলে আমজনতার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসাও শুরু হয়েছে। তারা আজ প্রধানমন্ত্রীর কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে— গাছের প্রথম ফলটি ও উন্নয়নের গরিষ্ঠাংশ তাদের ভাগেই যাবে, যাদের প্রয়োজন সবার চেয়ে বেশি। যারা স্বাধীন ভারতে নিঃসম্বল, তারা নিশ্চিতভাবে জানে তাদের কল্যাণকর্মে নরেন্দ্র মোদীর হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই। তিনি কর্মে নিমগ্ন।

দেশপ্রেমিক মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য

'সেভ ইণ্ডিয়া মিশন' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

'কাশ্মীর সমস্যা ও জওহরলাল নেহরু প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ'

মূল্য ৩০ টাকা

লেখক : **নিত্যরঞ্জন দাস**।। ভূমিকা — **অমিতাভ ঘোষ**

প্রাপ্তিস্থান : বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭২
সেভ ইণ্ডিয়া মিশন, বি.ই. ৩০০, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

ভারতের নাথ সম্প্রদায়

সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’, ১৫ মে, ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং নির্মলেন্দু চক্রবর্তী লিখিত ‘ভারতের নাথ সম্প্রদায়’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে নাথ সম্প্রদায়ের উদ্ভব বা সৃষ্টি সম্পর্কে লেখক বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন। লেখার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,— “যতদূর জানা যায়, নাথ সম্প্রদায় মূলত বাংলা তথা পূর্ব ভারতের। এটি উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা থেকে।...এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকেই নাথ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং পূর্বোক্ত না হিন্দু না মুসলমান বৌদ্ধদের নিয়ে নাথ সম্প্রদায় গড়ে উঠলো বলে আমরা মনে করি।”

এখানে ‘আমরা মনে করি’ কথাটির মধ্যে ব্যক্তিগত মতামত নিহিত রয়েছে। কারণ মনে করা কথাটি আপেক্ষিক। সত্য ও অসত্য দুই-ই হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি যখন একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্পর্কিত তখন প্রবন্ধটির মধ্যে শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি থাকাটা ছিল বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত।

এক্ষেত্রে লেখকের কাছে প্রশ্ন—

(১) নাথ সম্প্রদায়ের উদ্ভব যদি বৌদ্ধধর্ম থেকে হয়ে থাকে তাহলে গোরক্ষপুরের যোগীরাজ গম্ভীরনাথজীও বৌদ্ধ। আর তাই যদি হয়, তাহলে ‘ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’ ও ‘হিন্দু মিলন মন্দির’-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দু হয়ে, সজ্ঞানে এবং সন্ন্যাসী হওয়ার সংকল্প নিয়ে একজন বৌদ্ধধর্মগুরু’র কাছে শৈবযোগধর্মে দীক্ষালাভ করেন কোন যুক্তিতে?

(২) গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ হলে তাঁর নামাঙ্কিত গোরক্ষপুরের গোরক্ষমঠে বুদ্ধমূর্তির পরিবর্তে শিবলিঙ্গ কেন প্রতিষ্ঠিত? আবার সেই গোরক্ষমঠের মোহান্ত এবং উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বেশভূষা, আচার-আচরণ, ধর্মচর্চা ইত্যাদি কেন বৌদ্ধধর্মগুরু (লামা)-দের মতো না হয়ে শৈবসন্ন্যাসীদের মতো? তিনি যদি বৌদ্ধই হবেন তাহলে তিনি কানে কেন কুণ্ডল ধারণ করেন? বৌদ্ধরা কী কানে কনফট্ যোগীদের ন্যায় কুণ্ডল ধারণ করেন?

(৩) যোগেশ্বর শিব ত্রিশূলধারী। ধারণ করেন রুদ্রাক্ষের মালাও। আবার শৈবনাথযোগীরাও ত্রিশূল-রুদ্রাক্ষধারী। প্রকাশিত প্রবন্ধটির মাঝে যোগীরাজ গম্ভীরনাথজীর ছবিটিও ধ্যানরত ধূর্জটির অনুরূপ।

(৪) ইতিহাস এমন কথাই বলে যে, বাংলায় মুসলমান শাসনে বৌদ্ধ, হিন্দু তথা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সবাই নির্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন ও ধর্মান্তরকরণের শিকার হয়েছিলেন। তাহলে কোন স্বার্থেই বা মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা নাথ সম্প্রদায় গড়ে তুললেন?

লেখক নাথ সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ বলেছেন। হ্যাঁ, নাথপন্থের সঙ্গে বৌদ্ধপন্থার অনেক মিলও রয়েছে। যেমন : তন্ত্র, কৌল, যোগ, ইন্দ্রজাল, সিদ্ধ, পদবী, ধ্যান, মুদ্রা, আহার, আচার, অনুষ্ঠান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরাজিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘শৈব’ ছিলেন।

তিনি নেপালে শৈবধর্মই প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির অনেকটার সমর্থক। তাই নেপালের বৌদ্ধদের কাছে পূজ্যপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথ ‘অবলোকিতেশ্বর’ রূপে পুজো পেয়ে আসছেন আজও। তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথও নেপাল-সহ আসমুদ্রহিমাচল শৈবনাথধর্ম ও যোগধর্ম প্রচার করেছেন। আজও নেপালে তিনি বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা। তিনি ছিলেন শৈবনাথ ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংযোগ সেতু স্বরূপা (B.H. Hudson)। এই সব কারণে কারো কারো কাছে তাঁরা বৌদ্ধ বলে বিবেচিত হওয়াটা বিচিত্র নয়। তবু তাঁরা বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি শৈবধর্মের পাশুপত মতের আচার্য ছিলেন। আর গোরক্ষনাথপন্থীদের মন্ত্র ‘শিব-গোরক্ষ’, তাঁদের তীর্থ শৈবতীর্থও পরিচ্ছদ শৈবযোগীদের অনুরূপ। তাছাড়া নাথ যোগীরা যে ‘শিবগোত্রীয়’ তা তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্বেই বর্ণিত হয়েছে।

চিঠিপত্র

‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণম্’-এর ব্রহ্মখণ্ডম্-এ উক্ত হয়েছে,--- ‘জগৎপিতা বিধাতা কোপাসক্ত হলে ব্রহ্মতেজে তাঁর ললাটদেশ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তখন তাঁর ললাট থেকে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এই রুদ্রগণের পত্নীগণ অনেক শিবভক্ত পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এতসাং বহবঃ পুত্রা বভুবুঃ শিব পার্ষদাঃ।’

কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর ‘Dying Race’ গ্রন্থে লিখেছেন— ‘The yogis have successfully Contested with the Brahmins.... their origin was in no way inferior to that of the Brahmins.’ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া লিখেছেন,—‘বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব হইতে আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চল শৈব জাতীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।’ খ্রিস্ট্রীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থী যোগী সন্ন্যাসীগণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণরূপে গৌড়বঙ্গ ও ত্রিকলিঙ্গের সর্বত্র সমাদৃত হইতেন।

পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩২৯) লিখেছেন,— ‘রাঢ়েই তিনি (গোরক্ষনাথ) শৈবধর্ম প্রচার করেন। ...নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাংলায় বহু শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ...গোরক্ষনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন।’

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, —‘যোগীজাতির মধ্যে সংস্কৃত চর্চা খুব বেশি, তাহা দেখিয়া মনে হয় ব্রাহ্মণত্বের দাবি ইহাদের আছে। যাহা যাহাদের নাই; তাহা লইয়া তাহারা কখনও দাবি করে না।’

পরিশেষে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, হিন্দু জাতির স্বার্থে আজ যখন হিন্দু ঐক্য ও সামাজিক সমরসতার একান্ত প্রয়োজন, তখন লেখাটি হিন্দু সমাজের কাছে দেবে ভুল

বার্তা এবং হিন্দু-ঐক্য ও হিন্দুত্বকে করবে প্রশ্নবিদ্ধ।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

নারী পাচারের ফাঁদ

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলগুলির নারী নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে? কর্মহীনতা ও সচেতনতার অভাবের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর দালাল চক্র দীর্ঘকাল ধরেই সক্রিয়; শিশু ও নারীকে পশুর মতো পণ্য করা হচ্ছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান বলয়ের মানুষগুলির জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তা ভাবিয়ে তুলছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ভারতীয় চা বৈদেশিক বাজারে মর্যাদা ও সুনামের অধিকারী। কিন্তু মালিকপক্ষের বৈরিতা ও রাজনৈতিক তরজায় চা শ্রমিকরা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। তাছাড়া ন্যূনতম বেতন, তা দিয়ে একটি পরিবার চলার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই পরিবারের নারীরা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতে গিয়েও অনেক সময় মানব পাচারকারীর ফাঁদে পড়ে যায়। চা শ্রমিকদের জীবন- যন্ত্রণার আর্তনাদ নীচু থেকে উপর মহল পর্যন্ত পৌঁছলেও সমস্যার সমাধান সেই তিমিরেই। কর্মহীনতার সুযোগ নারী ও শিশু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এতদিন পর্যন্ত কাজের প্রলোভন দেখিয়ে একশ্রেণীর দালাল চক্রের মাধ্যমে ভিনরাজ্যে মানব পাচার রমরমিয়ে চলছিল। সরকার ও প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাচারকারী চক্র সাইবার পদ্ধতিকে হাতিয়ার করায় সমস্যা আরও জটিল আকার নিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার (ওয়াটস্ আপ, ফেসবুক ইত্যাদি) মাধ্যমে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে পাচার চক্রের ফাঁদে জড়ানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে এই মানব পাচারকারীরা সক্রিয়। কাজের প্রলোভন, প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেই নারীর জীবনে নেমে আসছে অন্ধকারময় জীবনের রাহুগ্রাস। কর্ম সমস্যায় জর্জরিত উত্তরবঙ্গের চা বলয়গুলি পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে।

নারী ও শিশুকে পণ্য করে মানব পাচারকারীরা দেশ ও সমাজকে বিশৃঙ্খল ও কলঙ্কিত করে তুলছে। সরকার, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলির নিরলস-আত্মিক সহযোগিতা ছাড়া মানবপাচার বিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলা অসম্ভব। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের অসহায় নারী ও শিশুকে সত্য ও সুন্দর জীবন প্রদান করাই কর্তব্য।

—**প্রণব সূত্রধর,**
আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার।

এই সময় ও রাজ্য বিজেপি

বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। মাঝিকে তাই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। বিশেষত এই কারণে যে অবাঞ্ছিত হাওয়ায় নৌকো টালমাটাল হয়ে যেতে পারে! বাংলায় কতিপয় নেতা আছেন যারা চিরকাল নেতা হয়ে থাকতে চান। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল— সব জমানাতেই ওরা নেতা। দল বদল করা ওদের কর্ম, ক্ষমতায় টিকে থাকা ওদের ধর্ম। এই হাওয়ায় ওদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনো মতেই সমীচীন হবে না। কংগ্রেস-সিপিএম- তৃণমূলের মতো নয়, বিজেপি একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দর্শিত— একাত্ম-মানব-দর্শন'-এর আদর্শ। জাতীয়তা এই দলটির মূল লক্ষ্য। সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে— একথা মোটেই বলা যায় না। সমতলে নির্বাচন হয়নি। শাসকদল তার ইচ্ছেমতো নির্বাচন করিয়েছে। পাহাড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় বিজেপির ফল যথেষ্ট ভালো হয়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আগামীদিনে বিজেপি সর্বত্র ভালো ফল করবে বলাই বাহুল্য।

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ বামফ্রন্টের দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মোক্ষম রায় দিয়েছিল। সিপিএমের পতন ও তৃণমূলের অভ্যুত্থান— সেই কারণেই। তৃণমূল কংগ্রেস যদি মনে করে থাকে তাদের এই উত্তরণ চিরন্তন তবে তারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন।

আসছে বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সর্বাত্মক ইতিবাচক ফলের আশা নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যতীত পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবে বাধা বিপত্তির পরেও অনেক অঞ্চলই বিজেপির দখলে চলে আসবে। কোনোরকম অঘটন না ঘটলে ১৯-র লোকসভা নির্বাচনে এই বঙ্গে বিজেপি ভালো ফল করবে বলে আশা করা যায়।

মনে রাখতে হবে, স্থূলতা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এখন অনেক সমাজ বিরোধী ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের আখের গোটানোর জন্য বিজেপির আশ্রয় প্রার্থী হবে। যদি ঔচিত্য-অনৌচিত্যের পার্থক্য বুঝতে না পারেন তাহলে সমূহ বিপদ। এই অনুকূল হাওয়া প্রতিকূল ঝঞ্ঝায় পরিণত হয়ে পাল সমেত নৌকোটিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই সাধু সাবধান!

—**অশোক কুমার ঠাকুর,**
কামেশ্বরী রোড (পূর্ব), কোচবিহার।

সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু

ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু। মুসলমানরা দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু। কিন্তু আসলে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি এরাই প্রকৃত সংখ্যালঘু। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু এই বিভেদ কাম্য নয়। সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবে শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া মানুষরা। আসলে দরিদ্র মানুষের কোনো জাত হয় না। কিন্তু এলাকার সংখ্যালঘু মানুষদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে ধর্মাচরণের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু বাস্তবে তা মিলছে না। তাই দেশ, রাজ্য বা জেলা নয় বিধানসভায় যারা সংখ্যায় কম তারাই সেই এলাকার সংখ্যালঘুর মর্যাদা পাক। এতে অসহিষ্ণুতা কমবে এবং দেশের সব শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তা বাড়বে।

—**প্রশান্ত কুমার কর,**
বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

সনাতন ধর্মের মূলকথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ধর্মের কথাই যদি বলা হয়, তাহলে আমরা সনাতনী। ধর্ম আমাদের শাশ্বত। অখণ্ড ভারতবর্ষেরই। সনাতন ধর্ম যেন মহাসাগর। —এর আদি নেই। নেই অন্তও। আলাদা করে নেই কোনো প্রবর্তক। নানা ধারায় প্রবাহিত সে ধর্ম। কিন্তু সবশেষে লক্ষ্য সেই এক।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল
নানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি
পয়সামর্ণব ইব।।

—সব নদী যেমন মেশে সাগরে— অনেকটা সেই রকম। অন্তিমে সেই পরব্রহ্মে মিশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পথ হিসেবে দেখা দিল নানা সম্প্রদায়ের। কিন্তু সকলেরই শিকড় সেই বেদে। উপাস্য নানা। ধারাও বহু। তবুও অন্তরে বৈদিক ধর্ম এক, অনন্য।

বৈদিক ধর্মের নানা ধারা মিলে মিশে আজ দাঁড়িয়েছে পঞ্চোপাসনায়। যে সম্প্রদায়েরই মানুষ হোক, প্রত্যেকেই শিব, নারায়ণ, শক্তি, গণেশ ও সূর্যের উপাসনার পর অর্ঘ্য নিবেদন করেন আপন উপাস্যকে। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর— এই পাঁচ সম্প্রদায়ের সমন্বয়েই বহমান সনাতন ধর্ম-ধারা। বিদেশি শাসকদের চক্রান্তেই সনাতনীরা আজ কিছুটা হলেও দিক্‌ভ্রান্ত। তাদেরই প্রচার কৌশলে আজ হিন্দুদের অনেকের ধারণা— এ ধর্ম শুধু যাগ-যজ্ঞ-পূজা সর্বস্ব। শুধু প্রাপ্তির প্রার্থনা এর মন্ত্রে, তত্ত্বে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি উদাসীন এই ধর্ম। ঐহিক জীবনকে বাদ দিয়ে শুধুই পরমার্থের কথা। জীবনবিমুখ নেতির দার্শনিকতায় ভরা এই ধর্ম।

এখনও অভিযোগ শোনা যায়, ইসলামে আদর্শ জীবন যাপনের বহু নির্দেশ থাকলেও সনাতন তথা হিন্দুধর্মে তা অনুপস্থিত। এক ধরনের অজ্ঞতায় আবিষ্ট থেকে, বৈদিক তথা সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি না পড়ে, কেবলই কিছু শোনা কথা আর অনুবাদ পড়ে বলা হয় এসব কথা। গভীরভাবে গ্রন্থগুলি পড়লে দেখা যাবে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বৈদিক গ্রন্থে যেভাবে প্রতিদিনের জীবন যাপনের কথা আছে, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত।

বাস্তবে এই সনাতন বা হিন্দু ধর্ম জন্মগত। এই ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আলাদা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না। সে কারণেই এই ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব কেন, সাধারণ বিষয় সম্পর্কেও আমাদের অনেকের মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের অজ্ঞতা। কিছু আবছা জ্ঞানে ভুল পথে যাওয়ার প্রবণতা।

সাধারণভাবে আমরা অনেকেই খেয়াল করি না অথবা জানি না, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ— এই নিয়ে বেদ। শুধু সংহিতা বা মন্ত্র অংশ সম্পূর্ণ বেদ নয় কখনই। একথা সত্যি, আমরা সনাতনীরা সততই অমৃতসন্ধানী। মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তরণ আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য কখনই অবহেলা করা হয়নি পার্থিব বা গার্হস্থ্য জীবনকে। বরং সুশৃঙ্খল, নীতিনিষ্ঠ, সদাচারী গৃহস্থ জীবনই যে অমৃত-সাধনার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে, সমাজকে ধরে রেখে, ধর্মচর্চা ও সাধনার পথ প্রশস্ত করে— এসব কথাই বলা হয়েছে আমাদের নানা ধর্মশাস্ত্রে।

বর্ণাশ্রম এই ধর্মের একটি কাঠামো। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস— এই চার আশ্রম এই ধর্মের চারটি স্তম্ভ। এই চারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গার্হস্থ্য আশ্রমের। কারণ, এরই উপর নির্ভর করছে বাকি তিনটি আশ্রম। এই আশ্রমটি না থাকলে শুধু বাকি তিনটি আশ্রম নয়, তাতে সামগ্রিক ভাবে বিপন্ন হবে মানুষের

অস্তিত্বই। তাই সর্বত্র এই আশ্রমের প্রশস্তি। একমাত্র এই গার্হস্থ্য আশ্রমেই সমান ভাবে সাধনা করা হয় ধর্ম-অর্থ-কামের। এই জীবন যত সৎ সুন্দর সুশৃঙ্খল এবং নীতিপরায়ণ হবে, ততই সঠিকভাবে অন্য আশ্রম-যাপনের পথ যাবে খুলে।

সনাতন ধর্মের মূল কথা হলো— সত্য বলবে, ধর্মপথে চলবে, সর্বজীবে প্রেম ও সেবায় উদ্বুদ্ধ হবে। তবেই মিলবে অমৃতপথে যাওয়ার ছাড়পত্র। সত্যই ধর্ম। মনুর কথায়, 'ন সত্যম্বিদ্যতে পরম্'— সত্যর সমান ধর্ম নেই। সেই ধর্মই সর্বদেবতা। সেই ধর্মানুচারী মানুষই দেবতার প্রতীক।

প্রসঙ্গত, পরব্রহ্ম ছাড়া আর সবই নশ্বর। দেবতারাও নন অমর। কল্পান্তে সব কিছুর সঙ্গে বিলুপ্তি ঘটে দেবতাদেরও। কল্পান্তে আবার হয় তাঁদের উদ্ভব। আসলে দেবতারা হলেন অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী।

দেবতাদের দুটি বিভাগ— আজানদেব এবং কর্মদেব। যাঁদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ, দেবত্ব লাভ করার জন্য আলাদা করে যাঁদের তপস্যা বা পুণ্যকর্ম করতে হয় না, জন্মরহিত এই দেবতরা আজানদেব। আর যেসব মানুষ পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন কর্মদেব। অশ্বিনীকুমার, ঋভু— এঁরা সকলেই কর্মদেব। এখানে স্পষ্ট, মানুষ সাধনার গুণেই দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের মধ্যেই রয়েছে দেবত্ব। শুধু তাকে তপস্যা বা কর্মের মধ্য দিয়ে জাগাতে হবে। এমন কথা কি আর কোথাও আছে?

বেদভিত্তিক সনাতন ধর্ম। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে আছে, চারটি বেদ হলো শরীর আর ছ'টি বেদাঙ্গ তার অঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ—মিলে ষড়্ বেদাঙ্গ।

কল্পে আছে নানা যজ্ঞ বিধি ও গার্হস্থ্যজীবন যাপনের নির্দেশ, সংস্কার ও নিয়মবিধি। গৃহস্থদের জন্য কল্পে আছে একটি বিশেষ বিভাগ— গৃহ্যসূত্র। কল্পের অন্য তিন সূত্রের নাম— ধর্ম, শুল্ব, এবং শ্রৌত।

গৃহ্যসূত্রে আছে গৃহীর করণীয় যজ্ঞের কথা। নাম যার পাকযজ্ঞ বা গৃহ্য যজ্ঞ। এরকম যজ্ঞের সংখ্যা সাতটি। পিতৃশ্রাদ্ধ, পূর্ণিমা- অমাবস্যার ব্রত, মাংস দিয়ে অষ্টুকা শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী শ্রাদ্ধ, আশ্বিনে আশ্বযুজী যজ্ঞ, অগ্রহায়ণে অগ্রাহায়ণী এবং চৈত্রে চৈতী যজ্ঞ। এই সাতটি হলো গৃহস্থের করণীয়। অনেকের মতে আশ্বিনের আশ্বযুজীই বর্তমানের কোজাগরী। অগ্রাহায়ণীই আজকের নবান্ন।

গৃহ্যসূত্রে আছে— দশবিধ সংস্কার, নিত্য করণীয় কর্তব্যের কথা। ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য। এই আশ্রমে বিবাহের পর প্রতিদিনের অবশ্য কর্তব্য পঞ্চাজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং নৃ বা মনুষ্যযজ্ঞ। প্রতিদিনের দেব স্মরণই দেবযজ্ঞ। ছোটো বড়ো সব প্রাণীর সেবা, খাবার দেওয়ার নাম ভূতযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ বলে পিতৃকুমার উদ্দেশে পিণ্ডদান, তর্পণকে। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হলো ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃ বা মনুষ্যযজ্ঞ।

গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী— নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য— এই তিন হলো গৃহীর তিন কর্তব্য। প্রতিদিনের করণীয়গুলি হলো নিত্যকর্ম। ছেলের বিয়ে ইত্যাদি নৈমিত্তিক এবং বিশেষ কামনা ফললাভের জন্য ব্রত ইত্যাদি হলো কাম্য কর্ম। এই তিন কর্মেরই মূলকথা সংযম, শৃঙ্খলা, অনুশীলন, শারীরিক- মানসিক শুচিতা রক্ষা, সত্ত্বগুণের বিকাশ এবং চিত্তের একাগ্রসাধন। এসব গুণ না থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। তখন পুরো ব্যাপারটাই হয় লোক দেখানো। শাস্ত্রের অভিমত এটাই। সব বর্ণের গৃহস্থেরই এই কর্মবিধি। তবে বর্ণ ও জীবিকা ভেবে কাউকে সবগুলিই, কাউকে বা কিছু বাদ দিয়ে এগুলি করতে হয়।

কেবল নিজের উন্নতি নয়, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলই আমাদের ধর্মের লক্ষ্য। তারই জন্য সব ক্রিয়াকর্ম। এ কারণেই প্রার্থনা— 'অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথিংশ্চ লভেমহি'— আমার যেন বিপুল ধনসম্পদ হয়। আমার কাছে যেন অতিথি ও প্রার্থী আসে। আমি যেন তাদের সকলের প্রার্থনা পূরণ করতে পারি। আমাকে যেন কখনও প্রার্থী হতে না হয়।

বৈদিক ধর্মের স্পষ্ট নির্দেশ— 'নার্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাখো ভবতি কেবলাদী'— কাউকে না দিয়ে একা যে অন্নগ্রহণ করে সে ঘোর পাপী। মনু সংহিতার স্পষ্ট নির্দেশ—

যাবদ্ ভ্রীয়তে জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাম্।

অধিকম্ যোভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।।

অর্থাৎ উদরপূর্তির জন্য যতটা দরকার তার বেশি সঞ্চয়ে চুরির অপরাধে অপরাধী হতে হয়। এর চেয়ে বড়ো সাম্য আর কীই বা হতে পারে?

সনাতন ধর্মের মূল কথা— অমৃত সন্ধান। সেই অমৃত পাওয়ার জন্যই চাই সংযম, সত্য ও সেবার অনুসরণ। সকলের সমান হওয়া। সমমন হওয়া। সকলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়া। সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান,— এটাই সনাতন ধর্মের মূলকথা। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

হাজিমে নাকামুরা : (১৯১২-১৯৯৯)

পরিচিতি : ইনি জাপানের অন্যতম গবেষক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত এবং পালি ভাষার অধ্যয়ন করে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তিনি প্রথম পালি ভাষা থেকে জাপানি ভাষায় ত্রিপিটকের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। তিনি প্রায় ১৭০টি মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন। 'দ্য হিস্ট্রি অফ্ আরলি বেদান্ত দর্শন' লিখে জাপানের বিশিষ্ট পুরস্কার 'ইম্পিরিয়াল অ্যাওয়ার্ড অব দ্য জাপানি অ্যাকাডেমি' প্রাপ্ত হন। তিনি টোকিওতে 'দ্য ইস্টার্ন ইনস্‌টিটিউটের' প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্যের জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

উদ্ধৃতি : ভারত এবং জাপানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব না পেলে আজকের জাপানি সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারতো না।

উদ্ধৃতি : মধ্যযুগ ও পুরাকালে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় মনোবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণা করেছিল। ভারতীয়রা ছিল অনেক বেশি যুক্তিবাদী। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল অতিত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করা।

উদ্ধৃতি : বিশ্বের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সঙ্গতি লক্ষ্য করেই ভারতের পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং অনুমোদনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়রা স্বভাবতই সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। ভারতে অনেক প্রকার দার্শনিক মতবাদের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দ্বারাই পরমতসহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল।

উৎস : জাপান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এশিয়া—হাজিমে নাকামুরা।

ফ্রিট্‌যোফ কাপরা : (১৯৩৯-)

পরিচিতি : ইনি প্রখ্যাত আমেরিকান পদার্থবিদ। তিনি দীর্ঘদিন সেন্টার ফর একোলিটেরাসির পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর লেখা পাঁচবারের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ, জনপ্রিয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতিপ্রাপ্ত পুস্তকটি হলো, 'দ্য তাও অব ফিজিক্স'।

উদ্ধৃতি : পুরাকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যে দৃষ্টিতে হিন্দু এবং বৌদ্ধরা দেখতো, বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার দুই স্তম্ভস্বরূপ অর্থাৎ 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' এবং 'আপেক্ষিকতাবাদ'—আমাদের বাধ্য করে সমগ্র বিশ্বকে ঠিক সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে।

উৎস : 'দ্য তাও অব ফিজক্স'— অ্যান এক্সপ্লোরেশন অব দ্য প্যারালেল্‌স বিটুইন মডার্ন ফিজিক্স অ্যান্ড ইস্টার্ন মিস্টিসিজ্‌ম—ফ্রিট্‌যোফ কাপরা।

উদ্ধৃতি : পৌরাণিক ঘটনাগুলির সময় সারণীটি সত্যই আশ্চর্যজনক। আধুনিক মানুষকে লেগেছে ২০০০ বৎসরেরও বেশি সময় আবার সেই একই পুরনো ধ্যানধারণাকে স্বীকার করতে।

উৎস : 'দ্য তাও অব ফিজিক্স'— ফ্রিট্‌যোফ কাপরা।

বি.দ্র. : কাপরা বহুবারই অধুনা প্রচলিত প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তিনি প্রাচ্যের পুরনো ঐতিহ্য এবং বিংশশতাব্দীর পদার্থবিদ্যার আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সমান্তরালভাবে তুলনা করতেন।

হেরম্যান হেস : (১৮৭৭-১৯৬২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মান-জাত প্রখ্যাত সুইস্ কবি এবং ঔপন্যাসিক। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৪৬ সালে। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি হলো— স্টেপেন উল্‌ফ, সিদ্ধার্থ এবং দ্য গ্লাস বিড গেম। প্রতিটি গ্রন্থেই দেখানো হয়েছে ব্যক্তির মধ্যে সততার সন্ধান, আত্মজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা।

উদ্ধৃতি : ভারত কেবলমাত্র এক ভূভাগ বা দেশই নয় বরং আত্মার জন্ম এবং যৌবনের আবাসস্থলও বটে; সর্বত্রই আছে আবার কোথাও নেই, শুনিয়েছে এক শাশ্বত এবং সনাতন একত্বের বাণী।

উৎস : এ কালেকশন অব ক্রিটিসিজ্‌ম; হেরম্যান হেস।

উদ্ধৃতি : সাক্রেড জুয়েল অব যোগা : উইসডোম ফ্রর্ম ইন্ডিয়াস বিলাভেড স্ক্রিপচারস অ্যান্ড টিচার্স—দাভে দ্য' লুকা।

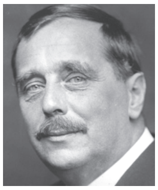

এইচ. জি. ওয়েলস : (১৮৬৬-১৯৪৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ইংরেজি ভাষার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো— বিজ্ঞান ভিত্তিক কথাসাহিত্য রচনা।

উদ্ধৃতি : ভারতের ইতিহাস বহু শতাব্দী ধরেই ছিল স্বপ্নের মতো, সুখী এবং শঙ্কামুক্ত। এইরূপ অনুকূল পরিস্থিতিতে তাঁদের চরিত্রও গঠিত হয়েছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং চিন্তাশীল রূপে। ভারত ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও এত অসংখ্য দার্শনিকের দেখা পাওয়া যায়নি।

উৎস : দ্য আউটলাইন অফ্ হিস্ট্রি— এইচ. জি. ওয়েল্‌স।

উদ্ধৃতি : হিন্দুধর্মে সহনশীলতা কোনো কূটনীতির বিষয় নয় বরং ইহা ধর্মের এক দৃঢ় স্তম্ভ।

উৎস : এনসাক্লোপিডয়া অব হিন্দুইজম—সুনীল সেহগল।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

অঙ্গনা

পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার অগ্রণী সৈনিক মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের সংস্কৃতিতে পুরুষ এবং প্রকৃতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এরা একে অন্যের পরিপূরক। একজনকে ছাড়া অপরজন অসম্পূর্ণ। সেজন্য প্রকৃতির প্রতি বিশেষভাবে সমর্পণভাব নারীর একান্ত নিজস্ব অনুভূতি। সেজন্য প্রকৃতি যেমন গাছপালা, জীবজন্তুকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে, মহিলারাও তেমনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে পালন-পোষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকে। আজ পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ রূপ যখন আমাদের জীবনযাত্রাকে কষ্টদায়ক করে তুলছে, তখন অনেক মহিলা এগিয়ে আসছেন এই ভয়াবহতা কম করার দায়বদ্ধতা নিয়ে। এই মুহূর্তে প্রকৃতিকে বাঁচানো কেবলমাত্র জরুরি নয়, অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। আবার আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানব-সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করে চলেছে। প্রাথমিকভাবে যে যত বেশি শোষণ করেছে, সে তত বেশি শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু এর ফলস্বরূপ প্রকৃতি দিনে দিনে রিক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধির মতো দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। মানুষ প্রকৃতির এই বিদ্রোহকে ভয় পায়। প্রকৃতি থেকে আমরা অনেক কিছু নিয়েছি, কিন্তু পরিবর্তে কী দিয়েছি? আজ প্রকৃতি ও পরিবেশ বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক দেশ চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তবে নিজেদের অত্যাধুনিক জীবনশৈলী এবং অভ্যাসকে পরিবর্তন করে ফিরে যেতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখানো পথে। সেই পথে প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই, আছে কেবলমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে অপত্যের অপূর্ব মেলবন্ধন!

আজ আমরা ইকোফ্রেন্ডলি দ্রব্য এই জন্য কিনি, কারণ আমরা ভেবে নিই যে, সেগুলি প্রকৃতির কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু ওইসব দ্রব্য প্রস্তুত করতে কতটা পরিবেশ দূষণ হয়, তা আমরা ভেবে দেখি না। প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, প্রকৃতি থেকে কম নাও। জলের অপচয় করো না, খনিজ পদার্থ কম বের করো এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করো। আমাদের ব্যক্তিগত চাহিদা সীমাহীন— একাধিক স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, মোটরবাইক, গাড়ি, হালফ্যাশনের পোশাক, জুতো ইত্যাদি। এগুলি কি খুবই জরুরি? যদি জরুরি হয়, তবে এগুলি কেনা এবং ব্যবহার তো আমরা কম করতে পারি। কারণ জিনিসগুলির উৎপাদন, ব্যবহার এবং ফেলে দেওয়া প্রতিটি স্তরেই পরিবেশ দূষিত হয়।

সেইরকম, ইকোফ্রেন্ডলি জিনিস কেনার সময় আমরা যদি একটু ভাবি যে, সত্যিই কী সেগুলি অপরিহার্য— তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। অধিকাংশ ইকোফ্রেন্ডলি দ্রব্য অনেক দামি হয়। যেমন— জৈবিক (অর্গানিক) খাবারের দাম সাধারণ খাবারের থেকে প্রায় তিরিশ শতাংশ বেশি। মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। একটু ভাবলে দেখব, আগে অনেকেই বাড়িতে টবে বা মাটিতে কিছু কিছু ফল-সবজি ফলাতেন। পুরনো কোনো জিনিস খারাপ হলে তা সারিয়ে নিয়ে ভালভাবে অনেকদিন চালাতেন। রাস্তার ফেরিওয়ালার থেকে শালপাতায় ফুচকা, আলুরদম, ঘুগ্‌নি মহানন্দে চেটেপুটে খেতাম। তখন সেগুলি থেকে না ছিল প্রকৃতি দুষণের আশঙ্কা, না ছিল প্যাকেজিং এবং তা ফেলে দিয়ে পরিবেশ দূষণের মতো কু-অভ্যাস। নতুন না কিনে পুরনো জুতো-চপ্পল, ব্যাগ, ছাতা সারিয়ে নিলে প্রকৃতির ওপর অন্যায় করা একটু কমবে। আগে বাড়িতে ধোপা আসত, বিদ্যুত ছাড়াই জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করে দিয়ে যেত। সবজি আনতে বাজার গেলে শারীরিক শক্তি এবং অর্থের সাশ্রয় হয়, পেট্রল পুড়িয়ে গাড়ি চড়ে নামি-দামি বাজারে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আজকাল রসগোল্লা আনতে গেলেও দোকানদার জিজ্ঞাসা করে— মাটির পাত্রে, না প্লাস্টিকে? সেখানেও দূষণ শুরু হয়ে গেছে। মহিলারা বিবেচনা করে দেখলে বুঝবেন যে, প্লাস্টিকের বাসন আপাতদৃষ্টিতে দেখতে আকর্ষণীয় হলেও মাটির ভাঁড় বা হাঁড়ির উপযোগিতা প্রচুর— জিনিস রাখা বা গাছের টব হিসেবেও সেগুলি অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আমাদের এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত প্রকৃতি এবং পরিবেশ রেখে যাবার দায়িত্ব মায়েদের। এই শুভ কাজে মায়েরা প্রাকৃতিক ভাবেই স্বভাবসিদ্ধ। তাঁরা তাঁদের পরিবার পরিজন দিয়েই তা শুরু করতে পারেন। সেজন্য— 'এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' ■

ভারতাত্মার সন্ধানে অ্যাপ্‌লের জনক

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্যতা যার মূলমন্ত্র হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং ভারতীয় দর্শন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, যা বার বার বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে এবং শাসনে স্বীয় অস্তিত্ব হারায়নি। যেখানে ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন মিশর, পারসিয়া, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি বহু পুরাতন সভ্যতার আজ আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, সেখানে এদেশে ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব আজও অবলুপ্ত হয়নি। কীসের জোরে এটা সম্ভব হয়েছে? ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে— শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যকলায়, চিন্তায় চেতনায় এক অপরাজেয় ভারতাত্মা বিরাজমান। এই ভারতাত্মাই ভারতীয়ত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। দীর্ঘকাল বিদেশি শাসনে থাকার ফলে ভারতীয়ত্ব বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তনও এসেছে অনেক, কিন্তু শত পরিবর্তনেও ভারতাত্মার মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা আজও সূর্যের মতোই চিরভাস্বর।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিভাবান, সৃষ্টিধর্মী মানুষ যখনই অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছেন, ছুটে এসেছেন ভারতবর্ষে। তাঁদের মানসিক অবসাদ, হতাশা দূর হয়ে গেছে এদেশে এসে, তাঁরা নতুন আলোয় জীবনকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতাত্মার পরশমণিকে তাঁরা বলেছেন— 'Divine Intervention'। এরকমই একজন মানুষ যিনি সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন ভারতাত্মার সন্ধানে, তাঁর নাম স্টিভ জোবস্। পুরো নাম স্টিভেন পল জোবস্ (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫— ৫ অক্টোবর, ২০১১)।

জোবসের শিক্ষা শুরু হয় মন্টা লোমা এলিমেন্টারি স্কুলে। তারপর কিছুদিন হোমস্টেড হাইস্কুলে পড়েন। মাঝখানে কিছুদিন কুপারটিনো জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর জোবস ভর্তি হলেন পোর্টল্যান্ডের রীড কলেজে যেটি ওরেগন স্টেটে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে জানাই যে জোবস পল ও ক্লারা জোবসের পালিত পুত্র ছিলেন। এক বোন প্যাটির সঙ্গে তিনি বড় হন। পল জোবস বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সারানোরও

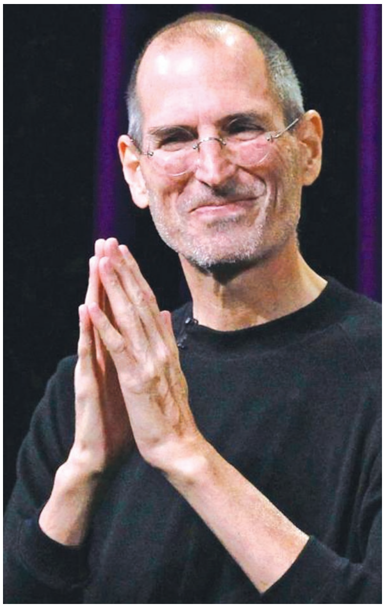

কাজ করতেন। মোটর গাড়ি সারানোর কাজটা তাঁর নেশার মতো ছিল।

জোবসের জন্ম হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রানসিস্কোতে। ১৯৬১ সালে তাঁর পরিবার ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে চলে আসেন। এই স্থানটি ইলেকট্রনিক্সের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। রেডিও, টেলিভিশন, স্টিরিও এবং কম্পিউটারের পদ্ধতি প্রকরণের মূল বিষয়টিই ছিল ইলেক্ট্রনিক্স। ওই সময় লোকজন এই এলাকাটিকে বলত সিলিকন ভ্যালি। তার কারণ ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র তৈরি করতে গেলে যে বস্তুটির প্রয়োজন, তাহলো 'সিলিকন।'

বাল্যকাল থেকেই স্টিভের সবকিছু নিজের হাতে তৈরি করতে ইচ্ছে হোত। ইলেকট্রনিক্সের এবং ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে তৈরি জিনিসপত্রের প্রতি তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ এবং কৌতূহল ছিল। বিশেষ করে কম্পিউটারের পেছনে যে বিজ্ঞান ও কারিগরী আছে, তা তাঁকে ভাবাতো। তিনি সবসময় ভাবতেন যে নতুন কিছু যদি করা যায়, তাহলে না জানি বাবা কত খুশি হবেন। রীড কলেজে স্টিভ দু'বছর পড়েছিলেন। কিন্তু একটি সেমিস্টারের পরেই তাঁর মনে নতুন চেতনার উন্মেষ হওয়ায়, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ও ভারতীয় দর্শন নিয়ে চর্চা শুরু করে দেন। কিন্তু বই পড়ে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন তা যথেষ্ট নয় বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষ তাঁকে তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তিনি সে ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি।

টি-শার্ট এবং একটি রংচটা জিনস্ পরে তরুণ স্টিভ উত্তর ভারতের নৈনিতালে কাঞ্চীধাম আশ্রমে আসেন। যখন তিনি এসেছিলেন, তাঁকে কেউ চিনত না। সঙ্গে তাঁর বন্ধু ড্যান কোট্‌কেও এনেছিলেন। স্টিভ কলেজে পড়াকালীন 'আটারি' নামে একটি ভিডিও গেমস্ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেই চাকরি ছেড়ে তিনি ভারতাত্মার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। 'অ্যাপ্‌ল' কম্পিউটারের চিন্তা তখন তাঁর মাথায় ছিল। কীভাবে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় ভেবে ভেবে যখন তিনি অস্থির, সেই সময়েই স্টিভ শাশ্বত ভারতের আহ্বান শুনতে পান তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে।

উত্তরাখণ্ডের ওই সাধারণ একটি পাহাড়ি আশ্রমে আরও অনেক আমেরিকান সংস্থা যেমন গুগ্‌ল, ই-বে ইত্যাদি থেকে স্বনামধন্য বহু প্রযুক্তিবিদ এসেছেন। ভারতাত্মার মাহাত্ম্য তাঁদের মুগ্ধ করেছে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্য মুক্ত হয়ে তাঁরা ভারতে এসেছেন মানসিক শান্তির আশায়। সৃষ্টিধর্মী কাজে নতুন উদ্দীপনা, নতুন আশা নিয়ে ফিরে গেছেন নিজের দেশে।

ভক্ত-শিষ্যদের বিবরণ থেকে জানা যায়

যে কাঞ্চীধামের ওই মন্দির ও তৎসংলগ্ন আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যার নাম ছিল নিম কারোলী বাবা। অন্তত এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। এই সন্ন্যাসী কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে এসে কিছুদিন এক গুহার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। প্রথম ওই স্থানে তাঁরই উদ্যোগে মন্দির তৈরি হয় ১৯৬৪ সালে। তারপরেই আশ্রমটি গড়ে ওঠে ভক্তসাধারণের সহায়তায়। কথিত আছে যে স্বয়ং হনুমান ওই সন্ন্যাসীর রূপ ধরে এই স্থানে এসেছিলেন।

নিম কারোলী বাবা আশ্রমে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি শাল গায়ে জড়িয়ে বসতেন, ভক্তদের ধ্যান করতে বলতেন, যাতে তাদের কর্মশক্তি ও মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি বলতেন, যে মানবজন্ম অতি দুর্লভ, চেষ্টা করতে হবে যাতে এই জন্মটি সার্থকতা লাভ করে। সকলের ইষ্ট করার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব। আরও বলতেন, 'ইষ্ট করতে না পারো, কখনও কারও অনিষ্ট কোরো না।' তাঁর একটি কথা দেশি-বিদেশি সকলকে মুগ্ধ করত, 'মনে রাখবে আমরা কেউ কারও পর নই, সবাই সবার আপন।' এটাই তো উপনিষদের শাশ্বত বাণী— যা যুগে যুগে মানুষকে দিয়েছে অনুপ্রেরণা, দূর করছে তার নিঃসঙ্গতা বোধ।

স্টিভকে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, বিশেষত ভারতের সুপ্রাচীন দর্শন টেনে এনেছিল এ দেশে। তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে নিম কারোলী বাবার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছিল, একথা তিনি নিজে তাঁর জীবনীকার ওয়াস্টার আইজাক্‌সনকে বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্টিভ যখন ওই আশ্রমে এসে পৌঁছন, তার কিছুদিন আগেই গুরুজীর দেহান্ত হয়।

স্টিভ বেশিরভাগ সময়েই আশ্রমের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াতেন, স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হতেন, তাদের সঙ্গে বসে নিরামিষ আহার করতেন। তাঁর সান্নিধ্য গ্রামবাসীদের খুবই ভাল লাগত। অবসর সময়ে স্টিভ 'এক যোগীর আত্মকথা' নামক একটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রিলিয়ান্ট্‌ জানিয়েছেন যে স্টিভ জীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল— 'Why we live? How we can do anything good in our lifetimes?' ব্রিলিয়ান্ট ওই আশ্রমে তিন বছর ছিলেন।

ড্যান কোটকের কথায়— 'স্টিভ ভারতের দর্শন, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি ভারতে আসার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। বিজ্ঞান যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, সেই সব প্রশ্নের উত্তর স্টিভ খুঁজতেন ভারতীয় দর্শন এবং প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চার মধ্যে। যখন তাঁর মনে অ্যাপলের চিন্তা ঘুরছিল তখন মাঝে মধ্যেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন মনে হোত প্রজেক্টটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল, কিছুই হবে না, শুধু সময় নষ্ট। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে শাস্ত্রজ্ঞ সাধুসন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর অস্থির চিত্ত শান্তিলাভ করে, এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রায় দু-দুটি বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন, নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পান। জীবনকে আর তাঁর অর্থহীন মনে হয়নি। তাঁর চিন্তায়, চেতনায় আমূল পরিবর্তন আসে। 'অ্যাপল্‌ আমি করবই' মনে মনে এই অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশে ফিরে যান। তার পরের ইতিহাস সবার জানা।

ফেসবুকের জনক মার্ক জুকেরবার্গ স্টিভ জোব্‌সের নির্দেশ মেনেই ভারতে এসেছিলেন ভারতাত্মার খোঁজে। নিউ দিল্লিতে টাউনহলের সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অকপটে বলেন যে যখন তাঁর সংস্থা প্রায় ডুবতে বসেছিল, তখন স্টিভ জোব্‌স, (যাঁকে তিনি গুরু মানতেন) মার্ককে ভারতে যেতে নির্দেশ দেন এবং কাঞ্চীধামের মন্দির ও দেবদর্শন করতে বলেন। মার্ক জুকেরবার্গের নিজের কথায়— "India is personally very important to the history of Facebook. This is a story I have not told publicly and few people know. Early on in our history, before things were really going well, we hit a tough patch. A lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. So I went and saw one of my mentors, Steve Jobs. He told me in order to reconnect with what I believed is the mission of the Company, I should visit this temple that he had gone to in India early in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be."

মার্ক আরও বলেন—

"So I went and I travelled for almost a month. Seeing the people and how they conected, having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced the importance of what we were doing. This is something I always remembered over the last ten years as we built Facebook."

মার্ক জুকেরবার্গ নৈনীতালের কাঞ্চীধামের ওই মন্দিরটি একাধিকবার দর্শন করতে এসেছেন, সেই কারণেই মন্দিরটির নাম হয়ে গেছে 'জুকেরবার্গ টেম্পল।'

ভারতীয়ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্টিভ জোবস্‌ মানব সভ্যতাকে দিয়ে গেছেন আই ফোন, আই প্যাড আই পড, যেটা হচ্ছে প্রথম কনজ্যুমার কম্পিউটার যার সঙ্গে থাকে একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আর একটা মাউস। অ্যাপল্‌ পার্সোনাল কম্পিউটার আবিষ্কারের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আরেকজন স্টিভ, স্টিভ ওজনিয়াক।

স্টিভ জোবসের মনে একটা কষ্ট ছিল তিনি প্রায়শই তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের কথা ভাবতেন। কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নটি তাঁর সৃষ্টিশীল মনকে পীড়া দিত। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ২০১১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আস্টোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁকে মনে রাখবো শুধু অ্যাপ্‌লের জন্য নয়, তাঁকে মনে রাখবো অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী এক ভারতপ্রেমিক হিসেবেও, যিনি তাঁর আবিষ্কারগুলির মধ্যে চিরঅমর হয়ে থাকবেন।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

পুস্তক প্রসঙ্গ

‘ঈশ্বর সন্ধানী এক পরিব্রাজক : নব বারতার আলোক বর্তিকা’

ড. অনুপম ডি. বর্মন

সম্প্রতি প্রকাশিত হলো ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়ের ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ ‘দেবালয় থেকে দেবালয়ে’। গ্রন্থটির নামকরণই বলে দেয় এটি একটি নিছক ভ্রমণ বৃত্তান্ত নয়। এলাম-দেখলাম-খেলাম-ঘুরলাম- চাহিদা মতো কেনাকাটা হলো আর হৈ হুল্লোর করে ফিরে গেলাম, সাধারণত এমনটিই তো হয়ে থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থটিতে লেখক ভারতবর্ষের প্রায় সব তীর্থস্থানের অন্তর্নিহিত পৌরাণিক গাথা, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-সামাজিক- দৈবিক-মানবিক-সনাতন ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বীয় বৃত্তে আবর্তিত হয়ে সাধু সঙ্গলাভে সাধারণ মানুষের দুঃখ সুখের পালায় অজানা কাহিনি যেমন বিধৃত করেছেন, তেমনি ভাবে লুঠেরা, বিধর্মী, বিদেশি, ধর্ম বিনাশকারী, মন্দির ধ্বংসকারী পশুগুলোর মুখোশ উন্মোচিত করেছেন। যদিও তীর্থ পরিভ্রমণকালে পুণ্য অর্জন আর দেব-দেবী দর্শন লেখকের পাখির চোখ হলেও তিনি দেবালয় সমূহের অন্তর্নিহিত অতীত বর্তমানের পৌরাণিক ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় বিধ্বংস পরিবর্তিত রূপকে তুলে ধরে সত্যান্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন যা পাঠক সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। আর বিস্মৃতপ্রায় হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দেয় তার অতীত ঐতিহ্যময় স্মরণীয় গৌরবোজ্জ্বল সোনালি যুগের কৃতিত্বকে। তাছাড়া সনাতন ধর্ম জীবনে সাধক সন্তদের অবদান আলোকবর্তিকা হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বর্তমান প্রজন্মের হিন্দু যুবমানসকে এক অলৌকিক জগতে যা সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে বলেই মনে হয়।

গ্রন্থটিতে সর্বমোট ২৩টি অধ্যায়ের ২২টি-তে ভারতবর্ষের পীঠস্থানগুলোর মধ্যে লেখক বিভিন্ন কুম্ভমেলা, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, নৈমিষারণ্য, কন্যাকুমারী, অনেক কটি মাতৃপীঠ, চারধাম, পঞ্চপ্রয়াগ, অমরনাথ ছাড়াও বহু পৌরাণিক বিখ্যাত তীর্থ সমূহের সরেজমিনে বিবরণ দিয়েছেন। তিনি সেই বিখ্যাত তাজমহলকে কবরস্থান রূপে না দেখে ‘চন্দ্রমৌলেশ্বর’ মন্দির হিসেবে বর্ণনা দিতে গিয়ে নানান তথ্য ও গবেষণাধর্মী তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও সোমনাথ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, শ্রীরাম জন্মভূমি ও

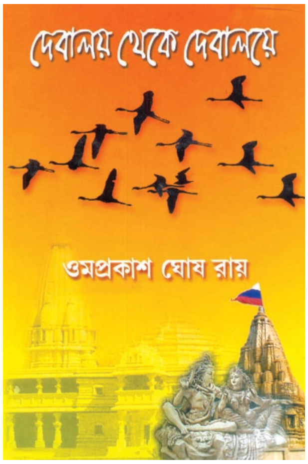

শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানের অনেক অজানা কাহিনিও তুলে ধরেছেন।

বইটির পরতে পরতে রয়েছে তীর্থ ভ্রমণের এক অনিন্দনীয় বিবরণ। লেখকের ভাষাতেই বলা যায়, ‘এই ভারতের পবিত্র পুণ্যভূমিতে অসংখ্য পুণ্যাত্মা সাধকের সাধনক্ষেত্র রয়েছে, রয়েছে মানব রূপে পরম পুরুষের জন্মসাধন লীলাময় পুণ্যস্থল আর মাতৃপীঠের মহিমান্বিত দেবীস্থান। যাঁর কোন এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ বলয় আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক দেবালয় থেকে অন্য দেবালয়ে, স্থান থেকে স্থানান্তরে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নদীতে-সাগরে হিম- শৈলতে পাহাড়ে-পর্বতে জলে-জঙ্গলে-মরুতে- নগরে-বন্দরে। এই বন্ধনহীন অসীম চলার পথে পবিত্র জলে অবগাহন করে নব বলে প্রাণিত হয়েছি। আমার পরিব্রাজক যাযাবর জীবন আমাকে দিয়েছে ঈশ্বর সন্ধান।’ সত্যিই তো ঈশ্বর সন্ধানের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক অতি সহজ সরল ভাষায় তাঁর ভ্রমণের আহরিত জ্ঞান বিশেষ করে হিন্দু তীর্থ সমূহ তথা দেবালয়গুলোর ধ্বংসের এবং নব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত শুধু নিজের মধ্যেই রেখে দেননি। এই জ্ঞান আপামর ভ্রমণ পিপাসু তীর্থ প্রেমীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। আর তাই যাঁরা তীর্থ ভ্রমণে যেতে চান কিংবা যাঁদের তীর্থে যাবার সামর্থ্য নেই কিংবা অক্ষম তাই যাওয়া হয়ে উঠে না তাঁদের জন্য এই গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং মানস ভ্রমণেও বন্ধুর ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

২২টি অধ্যায় ছাড়াও আরও একটি অধ্যায়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিন্দু তীর্থসমূহের এক অনবদ্য বৃত্তান্ত সংযোজিত হয়েছে। যাতে অনেক পৌরাণিক হিন্দু দেবালয়ের অজানা কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটির প্রায় সবকটি লেখাই পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে কলকাতার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন। আকর্ষণীয় মনোরম রঙিন প্রচ্ছদে শতাধিক রঙিন তীর্থস্থানের ছবি সংবলিত ৪০০ পৃষ্ঠার হার্ডবোর্ড বাঁধাই সংগ্রহে রাখার মতো এই অমূল্য গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ ভ্রমণার্থী পাঠকের কাছে সমাদর পাবে বলেই মনে করি। আমি শ্রী ঘোষ রায়ের ‘দেবালয় থেকে দেবালয়ে’ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

‘দেবালয় থেকে দেবালয়ে’ : ওম প্রকাশ ঘোষ রায়। প্রকাশক : এম.ডি. বুকস পাবলিশার্স অ্যান্ড সেলার্স। প্রচ্ছদ : প্রিয়াঙ্কা ঘোষ রায়। মূল্য : ৪০০ টাকা।

অন্য রকম

দন্তেওয়াড়ার প্রথম মহিলা আই এ এস
নম্রতা জৈন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খবরটা সম্ভবত কারোর চোখে পড়েনি। এ বছর ইউ পি এস সি পরীক্ষায় ৯৯তম স্থানটি দখল করেছেন একজন মহিলা। নাম নম্রতা জৈন। আপাতদৃষ্টিতে খবরটার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। ইউ পি এস সি পরীক্ষায় সফল হয়ে কত মহিলাই তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। কিন্তু নম্রতার উত্থান তত সহজ ছিল না। তার বাড়ি ছত্তিশগড়ের দন্তেওয়াড়ায়। যেখানে পদে-পদে বিছানো থাকে মাইন। মধ্যরাত কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণের শব্দে। যত্রতত্র চোখে পড়ে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। এমনই এক প্রেক্ষাপটে ছিল নম্রতার লড়াই।

নম্রতার পড়াশোনা কেপিএস ভিলাই স্কুলে। তারপর ভিলাই ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিগ্রিলাভ। কিন্তু যন্ত্রপাতির দুনিয়ায় বেশিদিন মন বসল না। শুরু হলো আই এ এস পরীক্ষার প্রস্তুতি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রয়াসে মিলল সাফল্য। নম্রতা বলেন, 'জানতাম পরীক্ষা ভালো দিয়েছি কিন্তু প্রথম একশো জনের মধ্যে থাকব ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।'

দন্তেওয়াড়া জেলা প্রশাসনের অধীন আইপিএস-আই এ এস অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি সেন্টার গ্রুপ নম্রতাকে ক্রমাগত উৎসাহ জুগিয়েছেন। দন্তেওয়াড়ার জেলা-কালেক্টরও ছিলেন এই গ্রুপের সদস্য। বস্তুত এঁদের সাহায্য না পেলে নম্রতার পক্ষে সফল হওয়া কঠিন হোত। কথাটা নম্রতা নিজেও মানেন। সেই জন্য সাফল্যের

কৃতিত্ব নিজে নিতে চান না।

অন্যদিকে নম্রতার অন্যতম শিক্ষক (দন্তেওয়াড়া জেলার কালেক্টর) সৌরভ কুমার যাবতীয় কৃতিত্ব নম্রতাকে দিয়ে বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরে চাইছি এখানকার ছেলেমেয়েরা আরও বেশি সংখ্যায় প্রশাসনিক কাজকর্মে আসুক। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম একদিন দন্তেওয়াড়ার কালেক্টর হবে এখানকারই কেউ। ভাবতে ভালো লাগছে সেই দিন আর বেশি দূরে নয়।' উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা একটি কোচিং অ্যাকাডেমি চালাচ্ছেন। নাম 'লক্ষ্য'। উদ্দেশ্য, দন্তেওয়াড়ার আই এ এস-পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

নম্রতার সাফল্যের আর এক কারিগর দন্তেওয়াড়ার জেলা পঞ্চায়েতের সিইও ড. গৌরব সিংহ। তিনি বলেন, 'নম্রতা প্রথমে দিল্লির একটি সংস্থায় ভর্তি হয়েছিল। ও দন্তেওয়াড়ায় থাকে জানার পর ওখানকার কেউ একজন আমাদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে।' এর কিছুদিন পর নম্রতা ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে দন্তেওয়াড়ায় ফিরে যান।

আই এ এস-এর মূল পরীক্ষার পর নম্রতা ইন্টারভিউ নিয়ে মারাত্মক টেনশন করতেন। গৌরব বলেন, 'আমরা দিনের পর দিন ওর মক ইন্টারভিউ নিয়েছি। আমার স্ত্রীও ইন্টারভিউ দেবার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছে।' নিঃসন্দেহে এই সময়ে নম্রতা দন্তেওয়াড়া সম্বন্ধে অনেককিছু জানার সুযোগ পান। এমনকী একজন প্রকৃত নেতার মতো তিনি ভাবতে শুরু করেন কীভাবে ছত্তিশগড়ের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সদর্থক পরিবর্তন আনবেন। তাই ইন্টারভিউ-এর পর তাঁকে যখন তাঁর পছন্দের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, নম্রতা নির্দ্বিধায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রের কথা বলেন।

একথা অনস্বীকার্য, ছত্তিশগড়ে নম্রতা রূপকথার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর সাফল্য দেখে অনেক যুবক-যুবতী দেশের কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে নম্রতা বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর আমি কোনো কর্পোরেট হাউসে চাকরি পেতে পারতাম। কিন্তু আমি বরাবর সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে চেয়েছি। নীতিগত ভাবে আমার পছন্দ নকশাল আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি। কারণ আমি এখানকার মানুষের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জীবনযাপন নিজের চোখে দেখেছি। তাই তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কাজ করতে চাই।'

দন্তেওয়াড়া তো বটেই, সারা ভারতবর্ষ তাকে তাঁর লড়াই-এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। উদ্বুদ্ধ করেছে আর একটি নতুন ইচ্ছেপূরণের গল্প বলার জন্য। ■

নাদালের লা ডেসিমা এক অনন্য নজির

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছর যেন 'গ্রান্ড ওল্ড মাস্টার্সদের' জয় জয়কার চলছে। একের পর এক গ্রান্ডস্লাম টুর্নামেন্টে 'মরা হাতি লাখ টাকা' আপ্তবাক্যটিকে বড় বেশি প্রতীয়মান বলে মনে হচ্ছে। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কিংবদন্তী রজার ফেডেরার অসাধারণ শৈলীর টেনিস খেলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে যে বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা করেন তাকেই আরো উজ্জ্বলতা দিল সদ্য সমাপ্ত ফরাসি ওপেনে নাদালের 'লা ডেসিমা'। ওপেন যুগে কোনো টেনিসতারকা দশবার গ্রান্ডস্লাম খেতাব জিতে যে কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তুলেছেন তা অতিক্রম করা অসম্ভব কঠিন কাজ পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে। তিরিশোর্ধ্ব নাদাল ক্লে কোর্টে যে গতিশীল, শক্তিশালী টেনিস খেলে প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত একটিও সেট না খুইয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন, তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এর আগে ২০০৮ আর ২০১০-য়ে ফরাসি ওপেন জেতার পথে একটিও সেট হাতছাড়া করেননি নাদাল।

ওই দুবারই নাদাল 'ব্যাক টু ব্যাক' অল ইংল্যান্ড খেতাব বা উইমবলডন জেতেন। এবারও কি সেই কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি হবে, তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই? তবে এক বছর আগে চোট আঘাতে জর্জরিত হয়ে যে নাদালের কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে বসেছিল তার পক্ষে যে এভাবেও ফিরে আসা সম্ভব তা বোধহয় অতি বড় স্বপ্নদর্শীও কল্পনা করতে পারেননি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ক্লে কোর্টের ইতিহাসে সর্বোত্তম খেলোয়াড় নাদাল। তবে উইমবলডনে ঘাসের কোর্টে যে সাউভলি নির্ভর পাওয়ার টেনিস খেলতে হয়, তার তুলনায় নাদালের বেসলাইন-ক্রসকোর্ট টেনিস এখন কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে কিছুটা প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। যদিও নাদালের পদযুগল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দ্রুতগতির রিফ্লেক্সের অধিকারী। আর জেতার জন্য যে কিলার ইনস্টিংকট দরকার তা এখনো পুরোমাত্রায় আছে। তাই জকোভিচ, মারে, ওয়ারিঙ্কা এমনকী ফেডেরারও নাদালকে নিয়ে বিশেষ হোমওয়ার্ক করে তবেই উইমবলডনের কোর্টে নামবেন।

ফরাসি ওপেন এবার প্রথম একজন আবাছাই খেলোয়াড়কে সিংহাসনে বসতে দেখল। মহিলা বিভাগে খেতাব জিতেছেন বিশ্ব টেনিসে পিছিয়ে থাকা দেশ লাতভিয়ার জেলেলা অস্টাপেঙ্কা। এক নম্বর ফেভারিট রুমানিয়ার সিমোলা হালেন যেন বিশ্বাস করতেই পারেননি এক অজানা গ্রহ দেখে উড়ে আসা জেলেলা তাকে এভাবে হেলায় হারিয়ে বিজয়ীর মুকুট মাথায় পরবেন।

মারিয়া শারাপোভা, সেরেভা উইলিয়ামস না থাকায় হালেনই ছিলেন ট্রফি জেতার এক নম্বর দাবিদার। ভেনাস উইলিয়ামস, ক্যারোটিনা ওজানিয়াকি, ডমিনিকা সিবুলকোভার মতো তারকাও এবার ফরাসি ওপেনে প্রত্যাশিত ছন্দে ছিলেন না। কিন্তু সিমোনের ভাগ্যে এবারও শিকে ছিড়ল না। এর আগেও একাধিকবার গ্রান্ডস্লাম ফাইনালে উঠে শেষ হাসি হাসতে পারেননি হালেন। এবারও তাকে লাইনচ্যুত করলেন অষ্টাপেঙ্কা।

এবছর আরো এক ভারতীয় গ্রান্ডস্লাম ট্রফির গায়ে নিজের নাম খোদাই করলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হলো রোহন বোপান্নার। কালাভার সুন্দরী টেনিস তারকা গ্যারিয়েলার সঙ্গে জুটি বেঁধে বোপান্না তার অধরা মাধুরি গ্রান্ডস্লাম খেতাব করায়ত্ত করলেন। এর আগে ২০১০-য়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ফাইনালে উঠেও শেষ পারানির কড়ি জোগাড় করতে পারেননি বোপান্না। তবে সানিয়া মির্জা, লিয়েন্ডার পেজ কিন্তু হতাশ করেছেন। লিয়েন্ডার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক বড় সাফল্য পেয়েছেন, দেশকে গৌরবের রাজশিখরে বসিয়েছেন। এবার বোধহয় তার লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়া উচিত। তবে যেহেতু উইমবলডন ফেডেরারের মতো লিয়েন্ডারেরও প্রিয় সার্ফেস তাই এর সেন্টার কোর্টে জ্বলে উঠতে পারেন। ■

কম্পিউটারের জনক

ম্যাম কম্পিউটারের ইতিহাস জিজ্ঞেস করেছিলেন আদিত্যকে। আদিত্য বলতে পারেনি। বাড়িতে কম্পিউটার আছে অথচ সে কম্পিউটারের ইতিহাস জানে না। ক্লাসে সবার সামনে ম্যাম তাকে তিরস্কার করেছে। আজ শনিবার। আগামী সোমবার কম্পিউটারের ইতিহাস জেনে আসতে হবে তাকে।

আদিত্য ক্লাসে পড়া পারে না এমন কোনোদিন হয় না। আজই ব্যতিক্রম। স্কুল ছুটির পর আদিত্য বাড়ি গেল না। সোজা চলে গেল খেলার মাঠে। কিছুক্ষণ খেলার পর আর খেলতেও ভালো লাগলো না। বার বার ক্লাসের ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মাঠের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। মনখারাপ নিয়ে আদিত্য নদীর ধারে এসে বসলো। আজ বাড়ি গিয়েই সে কম্পিউটারের ইতিহাস জানবে। এসব ভাবতে ভারতে কিছুক্ষণ কেটে গেছে। সেই সময় পেছনে এসে কে যেন ডাকলো— খোকা কী হয়েছে? ম্যাম বকেছে?

আদিত্য সব কথা খুলে বলল। ভদ্রলোক বললেন— ও, আচ্ছা! দাঁড়াও আমি তোমাকে কম্পিউটারের ইতিহাস শোনাচ্ছি। ভদ্রলোক আদিত্যর পাশে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন কম্পিউটারের ইতিহাস : আমরা আজ যে কম্পিউটার ব্যবহার করি তাকে বলে থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার। এর আগের দুটি জেনারেশন--- ফার্স্ট ও সেকেন্ড জেনারেশন। ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার যাঁর হাত ধরে এসেছে তাঁর নাম চার্লস ব্যাবেজ। এই চার্লস ব্যাবেজ ছিলেন একজন গণিতের অধ্যাপক। তিনি অঙ্কের গণনা করার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেন। মূলত অঙ্কের নানা হিসেব নিকেশ করার কাজ করা যেত সেই যন্ত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সেই গণনা যন্ত্রই নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে কম্পিউটারের রূপ নেয়। তাই চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

১৯৩৭ সালের পর সেই কম্পিউটারের আধুনিক সংস্করণ তৈরি হয়— ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার। তারও পরে আসে সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার। আর বর্তমানে আমাদের হাতে থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার। এটি আসে ১৯৬৩ নাগাদ।

আদিত্য মন দিয়ে শুনছিল ভদ্রলোকের কথা। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এবার তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আদিত্য উঠে পড়লো। ভদ্রলোক বললেন, সোমবার স্কুলে গিয়ে তাহলে ম্যামকে শুনিয়ে দেবে তো? কম্পিউটারের ইতিহাস? আদিত্য মাথা নাড়লো। বাড়ি ফিরে রাতে কম্পিউটার খুলে বসলো আদিত্য। ইন্টারনেটে সার্চ করলো কম্পিউটারের ইতিহাস। ভদ্রলোক যা বলেছেন ঠিক তাই। তারপর হঠাৎই আদিত্যর চোখ থেমে গেল কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজের ছবির উপর। আরে, বিকেলের সেই ভদ্রলোকের মুখের সঙ্গে তো চার্লস ব্যাবেজের মুখের হুবহু মিল, একই রকম দেখতে!

আদিত্য অবাক হয়ে গেল। এ কী করে হয়! মানুষের চেহারায় এরকম হুবহু মিল থাকে! পরেরদিন বিকেলবেলা আদিত্য আবার নদীর কাছে এসে দাঁড়ালো। চারিদিকে চেয়ে দেখলো সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখা যায় কিনা। অপেক্ষা করতে লাগলো। সন্ধ্যে হয়ে এল কিন্তু ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। তারপর আদিত্য অনেকবার নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, অনেক খুঁজেছে ভদ্রলোককে, কিন্তু আর কখনও তাঁর দেখা পায়নি।

স্বপন দাস

ভারতের পথে পথে

জালিয়ানওয়ালাবাগ

ঘটনাটি ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিলের। পঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে ইংরেজ সরকারের দমন পীড়নের বিরোধিতা করতে হাজির হয়েছে সহস্রাধিক জনতা। নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালায় ইংরেজ সেনা। দু' হাজারের বেশি মানুষ হতাহত হয়। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে হতবাক হয়ে যায় গোটা বিশ্ব। অথচ ইংরেজ সরকার এই ঘটনা সমর্থন করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। এই কুখ্যাত গণহত্যা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত।

এসো সংস্কৃত শিখি

যদা কদা বা ভবতু, অহং সিদ্ধ।

যখনই হোক, আমি তৈরি।

তান্ মম শুভাশয়ান্ নিবেদতু।

তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।

কিমর্থম্ এবং বদতি ?

কেন এরকম বলছ ?

কিঞ্চিত্কালং তিষ্টতু।

কিছুক্ষণ থাক।

অত্র পত্রালয়: কুত্র অস্তি ?

এখানে ডাকঘর কোথায় আছে ?

ভালো কথা

সাহসী মাসি

আমার ঠাকুমা প্রতিদিনই পাম্প চালান, আবার বন্ধও করেন। একদিন হয়েছে কী— পাম্প যখন বন্ধ করতে গেছেন, দেখেন পাম্পে আগুন লেগে গেছে। ঠাকুমা চিৎকার করে উঠেছেন। আমিও ভয় পেয়ে গেছি। ঠাকুমা আমার মাকে ডাকছেন। মা-ও এসেছে, আমিও এসেছি। মা ভাই-কে কোলে নিয়ে এসেছে। ভাই খুব ছোট্টো। কিছুতেই আগুন নিভছে না। আমার তখন খুব ভয় করছিল। মা চিৎকার করে সুইচটা বন্ধ করে দিতে বলল। তখন কিন্তু ভয়ে কেউ হাত দিচ্ছিল না। তখন মাসি সাহস করে সুইচ বন্ধ করে দিল। একটু পরে আগুনটা নিভে গেল। পাম্পটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। তারপরে মিস্ত্রিকে ডাকা হলো, মিস্ত্রি এসে পাম্পটাকে সারিয়ে দিল। আমরা মাসির জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলাম।

আরাত্রিকা মিশ্র, প্রথম শ্রেণী, রামপুর, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) দ ণ্য কা ণ্ড	(১) গ টা ন টা র
(২) বী ণু ণ অ	(২) শ ত অ জা ক্র

১ জুন সংখ্যার উত্তর	**১ জুন সংখ্যার উত্তর**
(১) সমসাময়িক (২) ফাইফরমাশ	(১) হৃদয়বিদারক (২) সংবাদমাধ্যম

উত্তরদাতার নাম

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২) অঞ্জনাভ পাল, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার (৩) অর্কমিত্রা রায়, মকদমপুর, মালদা (৪) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

MAKE IN INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

रेल बढ़े देश बढ़े
rail badhe desh badhe

SAVE LIFE , NOT TIME

Level Crossings are not the place to hurry.
Remember that your impatience may cost your life and vehicle.
A train can cover 15 metres in a flash of an eyelid and 25 metres in a second.

Let the train go first.

THINGS TO KEEP IN MIND AT

MANNED LEVEL CROSSING

Stop with your vehicle in front of a closed level crossing.
Never risk your life crossing over/under a level crossing gate.
Have patience at a closed level crossing especially when the train is approaching.

All the 61 unmanned level crossing gates over the jurisdiction of Eastern Railway, have been eliminated

REMEMBER

Forcibly crossing through a closed Railway Crossing is a punishable offence under Sec. 160 of the Railways Act, 1989

भारतीय रेल • INDIAN RAILWAYS

EASTERN RAILWAY

Be Alert. Be Safe

EXPRESSION

Follow us on @easternrailway @www.er.indianrailways.gov.in Like us on easternrail

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
26 June - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. || দাম ১০ টাকা ||